উপন্যাস

পিপুল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. পিপুলের জীবনটা 2
২. রণেশ ছবি আঁকে 28
৩. রণেশের সঙ্গে পিপুলের ঘনিষ্ঠতা................ 43
৪. পিপুল লজ্জার মরে গেল 56

১. পিপুলের জীবনটা

পিপুলের জীবনটা নানা গন্ডগোলে ভরা। সেই সব গন্ডগোলের বেশির ভাগই সে নিজে পাকায়নি, কিন্তু তাকে নিয়ে গন্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে। তার মাত্র চার-পাঁচ বছর বয়সে তার মা গলায় দড়ি দিয়ে মরে। বলাই বাহুল্য মায়ের আত্মহত্যার পিছনে প্রত্যক্ষ হাত না থাক, পরোক্ষ ইন্ধন ছিল তার মাতাল ও ফুর্তিবাজ বাবার। কিন্তু কিছু লোক থাকে, এমনিতে খুব গভীরভাবে খারাপ নয়, কিন্তু স্বভাবের চুলকুনির ফলে নানা অকাজ করে ফেলে। পিপুল যতদূর জানে, তার বাবা ভীতু ধরনের লোক, বউকে যথেষ্ট ভয় খেত এবং রোজ মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করত। নিরীহ হলেও মদ খেলে লোকটা একেবারে বাঘ হয়ে উঠত, তখন হম্বিতম্বি ছিল দেখার মতো। যাই হোক, নিত্য মদ নিয়ে এবং মদজনিত অশান্তি ছাড়াও সংসারে আরও বিস্তর খটামটি ছিল। সেসব অভাবজনিত নানা আক্রোশ আর ক্ষোভের প্রকাশ। তা ছাড়া দুই পরিবারের মধ্যেও বড়ো একটা সদ্ভাব ছিল না। বিয়ের সময়ে দানসামগ্রী ইত্যাদি এবং মেয়ের বাড়ির একটা গুপ্ত কলঙ্ক নিয়ে বিস্তর ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। ফলে পিপুলের সঙ্গে তার মামাবাড়ির সম্পর্ক ছিল না।

মা মরার পর, মামারা পুলিশ নিয়ে এসে বাড়ি ঘিরে তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল। পিপুলদের লোকবল, অর্থবল বিশেষ ছিল না। তবে তার ঠাকুর্দা এবং একমাত্র কাকা উকিল টুকিল লাগাল ঘটিবাটি বেচে। তার বে-আক্কেলে বাবা ছাড়া পেয়ে দিগ্বিজয়ীর মতো হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল। যার বউ সবে মরেছে তার যে হাসিখুশি হওয়া উচিত নয় এই বুদ্ধিটুকুও কেউ দেয়নি তাকে। এই সহজে রেহাই পাওয়া ইদানীং হলে হত না। ইদানীং বউ মরলে স্বামীকে দেশছাড়া হতে হয়, নইলে থানা-পুলিশ নাকাল করে মারে। তার বাবা অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়াটা কাটিয়েই কদিন খুব ফুর্তি করল। তখন পিপুল তার কাকিমার কাছে খানিকটা লাথি-ঝাঁটা খেয়েই পড়ে আছে। কাকিমার দোষ নেই, তার

অনেক কটা ছেলেপুলে, অভাবের সংসার, তার ওপর মাতাল ভাশুর। পিপুল একটু দুষ্টুও ছিল বটে, কাকা দাদু বাবা সবাই তাকে প্রায় পালা করে পেটাত।

এইভাবে সে তার জীবনের গন্ডগোলগুলো টের পেতে শুরু করে।

মা-মরা ছেলেদের অনেক সমস্যা থাকে। পিপুলেরও ছিল। কিন্তু সে-সব গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছিল তার। সংসারে কারো কাছে ভালো ব্যবহার পেত না বলে ঘরের চেয়ে বাইরেটাই ছিল তার প্রিয়। সারাদিন স্কুল ছাড়া তাকে দেখা যেত রাস্তায় ঘাটে, নদীর ধারে, মাঠে জঙ্গলে।

ওদিকে বাবার অবস্থা ক্রমশ সঙ্গিন হয়ে উঠছে। টাকা-পয়সা যা রোজগার করে তা উড়িয়ে দেয় হাজারো ফুর্তিতে। যে বাপ টাকা দেয় না, তার ছেলের দুর্দশা তো সবাই জানে। কাকা কাকিমা আর দাদু মিলে তাকে রোজ বিস্তর খারাপ কথা শোনাত।

একদিন পয়সার অভাবে তার বাবা তাকে কাজে লাগানোর একটা উদ্ভট চেষ্টা করেছিল।

সেটা রবিবারই হবে। সকাল বেলায় তার বাবা তাকে ডেকে খুব হাসি-হাসি মুখে বলল, ওরে পিপুল, মামাবাড়ি যাবি?

পিপুল অবাক হয়ে বলে, মামাবাড়ি! সেখানে কে আছে?

আছে রে আছে। তাদের মেলা পয়সা হয়েছে। যাবি?

গিয়ে?

গিয়ে? গিয়ে মামা, মামি, মাসি, দাদু, দিদাদের একটু পেন্নাম করে আসবি। তোর দিদিমা খুব ভালো লোক। খুব চুপিচুপি তোর দিদিমার কানে কানে একটা কথা বলবি। বলবি, তোর মায়ের গয়নাগুলো যেন তোর কাছে দিয়ে দেয়।

গয়না! বলে হাঁ করে চেয়েছিল পিপুল।

তোর মা গলায় দড়ি দেওয়ার আগে গয়নাগুলো সব সরিয়ে ফেলেছিল। মনে হয় তোর দিদিমার কাছেই গচ্ছিত রেখে এসেছিল। ওগুলো পেলে এখন আমরা বাপ-ব্যাটায় একটু খেয়ে-পরে থাকতে পারি। তোর মামাবাড়ির অনেক পয়সা। হাত ঝাড়লেই পর্বত। ছেঁড়া জামাটামা পরে নিস, তাহলে তাদেরও একটু মায়া হবে।

পরদিন ছেঁড়া আর ময়লা জামা পরিয়ে, খালি পায়ে হাঁটিয়ে তাকে নিয়ে তার বাবা শ্বশুরবাড়ি চলল। লোকাল ট্রেনে মিনিট পনেরোর পথ। স্টেশন থেকে রিকশায় অনেকখানি। মামাবাড়ি থেকে দু ফার্লং দূরে রিকশা থেকে নেমে পড়ল তারা।

বাবা বলল, ওই সোজা রাস্তা। একটু এগিয়ে প্রথম ডানহাতি রাস্তায় ঢুকলেই দেখতে পাবি, সামনে পুকুরওলা পুরোনো বাড়ি। সোজা ঢুকে যাবি ভিতরে।

পিপুল কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, কাউকে চিনি না যে!

দুর বোকা! চেনাচেনির কী আছে? গিয়ে বলবি আমি অমুকের ছেলে। আমার নামটা বলবার দরকার নেই, মায়ের নামটাই বলিস। মা-মরা ছেলে তুই, তোকে আদর-যত্নই করবে মনে হয়। তবে আদরে কাজের কথাটা ভুলে যাস না বাবা। গয়নার কথা মনে আছে তো! খুব চুপিচুপি দিদিমাকে বলবি, আর কাউকে নয়। আমি এই যে চায়ের দোকানটা দেখছিস, এখানেই থাকব। কাজ হয়ে গেলে এখানে এসে ডেকে নিবি। আর শোন, আমি যে সঙ্গে আছি একথা খবর্দার বলিস না কাউকে!

ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নিয়ে পিপুল অনিচ্ছের সঙ্গেই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। তার বুকটা দুরদুর করছিল। মামাবাড়ির কাউকেই সে ভালো চেনে না। কোন শিশুকালে মায়ের সঙ্গে আসত, কিছু মনেই নেই তেমন।

পুকুরওলা বাড়িটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না। পুকুরের পাশ দিয়ে একটা ইট-বাঁধানো সরু পথ। সেই পথ একটা পুরোনো পাকা বাড়িতে গিয়ে

শেষ হয়েছে। বাড়িটা বেশ বড়ো এবং দোতলা। লাল রঙের। বাগান আছে, কয়েকটা নারকেল আর সুপুরির গাছ আছে।

পিপুল খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। খিদেয় তেষ্টায় বড়ো নেতিয়ে পড়েছে সে। ও বাড়িতে গেলে খেতে দেবে কিনা সেইটেই ভাবছিল সে। আবার ভাবছিল, যদি তাড়িয়ে দেয়!

পুকুরে একজন বউ-মানুষ চান করছিল। ভরদুপুরে আর কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। বউ মানুষটি স্নান সেরে বাড়ির পাকা ঘাটলায় উঠে গামছা নিংড়োতে নিংড়োতে তার দিকে চেয়ে বলে, এই ছোঁড়া, তখন থেকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস ড্যাবড্যাব করে? চুরিটুরির মতলব আছে নাকি? যাঃ এখান থেকে।

পিপুল ভয় খেয়ে গেল। তারপর করুণ গলায় বলল, আমি গিরীশ রায়ের বাড়ি যাব।

কেন রে, সেখানে তোর কি?

পিপুল বলল, সেটা আমার মামাবাড়ি।

মামাবাড়ি! বলে বউটি অবাক, এটা তোর মামাবাড়ি হল কবে থেকে রে ছোঁড়া? চালাকি করছিস?

আমার দাদুর নাম গিরীশ রায়।

বউটা এবার ধমকাল না। খুব ভালো করে তার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর বলল, শ্রীরামপুর থেকে আসছিস নাকি?

হ্যাঁ।

তোর বাবার নাম হরিশচন্দ্র?

পিপুল অবাক হয়ে বলে, হ্যাঁ।

কী চাস এখানে? কে তোকে পাঠাল?

বাবার শেখানো কথা সব ভুলে গেছে পিপুল। কিন্তু বেফাঁস কথাও যে বলা চলবে না এ বুদ্ধি তার ছিল। সে বলল, আমার বড়ো জলতেষ্টা পেয়েছে। একটু জল দেবেন?

তেষ্টার কথায় সবাই নরম হয়। বউটাও হল। বলল, আয় আমার পিছু পিছু।

বাড়ির ভিতরে মস্ত ঝকঝকে উঠোন। তাতে ধান শুকোচ্ছে। বেশ কয়েকটা মাড়াই আর খড়ের গাদা। বউটা উঠোনে পা দিয়েই হঠাৎ পাড়া মাত করে চেঁচিয়ে উঠল, দেখেছ তোমরা, কে এসে উদয় হয়েছে। ওই যে খুনে হরিশচন্দ্রের ব্যাটা। নিশ্চয়ই ওই মুখপোড়াই নিয়ে এসেছে।

চেঁচামেচিতে লোকজন বেরিয়ে এল। একজন বুড়ো মানুষ, জনাতিনেক পুরুষ। সকলের চোখ তার দিকে।

পুরুষদের মধ্যে চোয়াড়ে চেহারার একজন বারান্দা থেকে নেমে তার সামনে এসে দাঁড়াল। কড়া গুল্লু গুল্লু চোখে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, কার ব্যাটা তুই?

আমার বাবার নাম শ্রীহরিশচন্দ্র ঘোষ।

ও বাবা! বাপের নামের আগে আবার শ্রী লাগায় দেখছি। তোর মায়ের নাম কি?

আশালতা ঘোষ।

বারান্দা থেকে সেই বুড়ো লোকটি বলল, অত জিজ্ঞাসাবাদের দরকার নেই। মুখে ওর মায়ের মুখের আদল আছে।

পিপুলের ভারি ভয় আর অপমান লাগছিল। বাবা তাকে এ কোন শত্রুপুরীতে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল।

চোয়াড়ে লোকটা বলল, কে তোকে এ বাড়িতে পাঠিয়েছে?

পিপুল কাঁদো-কাঁদো হয়ে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলল, কেউ পাঠায়নি।

তুই নিজেই এসেছিস? একা?

পিপুল মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

তোর বয়সি ছেলে শ্রীরামপুর থেকে এখানে একা আসতে পারে?

পিপুল চুপ করে থাকল।

কী চাস তুই?

পিপুল মুখস্থ-করা কথাগুলো বলে গেল, আমি মা-মরা ছেলে। বাড়িতে খুব অনাদর। আমার একটু আশ্রয় হলে ভালো হয়।

কাল রাতে তার বাবা তাকে এ কথাগুলোই শিখিয়ে দিয়েছিল। মুখস্থও সে ভালোই বলেছে। কিন্তু হঠাৎ চটাস করে একটা চড় যে কেন এ সময়ে তার গালে এসে পড়ল কে জানে!

বুড়ো লোকটি বলল, আহা, মারিস কেন?

চোয়াড়ে লোকটা বলে, মারব না? কেমন যাত্রার পার্টের মতো শেখানো কথা বলছে দেখো! মা-মরা ছেলে, অনাদর, আশ্রয়-এসব মুখ থেকে কখনো বেরোয়? এই ছোঁড়া, কে তোকে এখানে এনেছে সত্যি করে বল!

মারধরে কিছু হয় না পিপুলের। নিজের বাড়িতে নিত্যই মার খায় সে। রাস্তায়-ঘাটেও ছেলেদের সঙ্গে তার নিয়মিত মারপিট হয়। স্কুলে মাস্টারমশাইরা ঠেঙিয়ে তার ছাল তুলে দেন মাঝে মাঝে। চড়টা খেয়েও তাই সে দমেনি। কিন্তু বাবার কাজটা যে হবে না সে

বুঝতে পারছিল। সে চোয়াড়ে লোকটার দিকে চেয়ে সত্যি কথাই বলল, বাবা নিয়ে এসেছে আমাকে।

চোয়াড়ে লোকটা লাফিয়ে উঠে বলল, কোথায় সেই শয়তানটা? আজ ওটাকে পুকুরের কাদায় পুঁতে রাখব। লাশটাও কেউ খুঁজে পাবে না। বল ছোঁড়া, কোথায় খুনে বদমাশটা?

পিপুল মাথা বাঁচাতে বলে ফেলল, একটা চায়ের দোকানে বসে আছে। মোড় পেরিয়ে বাঁ দিকে।

চোয়াড়ে লোকটা সঙ্গেসঙ্গে দুই লম্ফে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর যা হয়েছিল তা দেখেনি পিপুল। তবে শুনেছে। তার মেজো মামা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাঁকে-ডাকে লোক জোগাড় করে চায়ের দোকান থেকে তার বাপকে টেনে বের করে হাটুরে মার মারে। হাসপাতালে দিন পনেরো পড়ে থাকতে হয়েছিল তার বাপকে। পুলিশ-কেস হয়েছিল। বিরাট গন্ডগোল।

কিন্তু ইতিমধ্যে পিপুলের যা হয়েছিল সেইটেই আসল কথা। মামা বেরিয়ে যাওয়ার পরই দাদামশাই অর্থাৎ সেই বুড়ো মানুষটি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন, ওরে কি জানি কোন খুনোখুনি হয়ে যায়! ওরে তোরা দেখ, কালীপদর মাথা তো গরম, কী কান্ড করে ফেলে!

দাদামশাইয়ের চেঁচামেচিতে কয়েকজন মহিলা নানা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন পাকাচুলো বুড়ি। পরে জেনেছে সে-ই দিদিমা। তবে দাদু দিদিমা মাসি মামি সব কেমন হয় তা তো জানা ছিল না পিপুলের। সে হাঁ করে এঁদের দেখতে লাগল।

দিদিমা তার দিকে চেয়ে বলল, এ ছেলেটা কে?

দাদু বলল, তোমার নাতি গো, চিনতে পারছ না? আশার মুখ একেবারে বসানো!

দিদিমা ভারি অবাক, আশার ছেলে? এর নামই তো পিপুল।

তা হবে। নাম-টাম জিজ্ঞেস করা হয়নি। ওদিকে কালীপদ যে কোন সর্বনাশ করতে বেরিয়ে গেল কে জানে! এর বাপটাকে বোধ হয় ঠেঙিয়েই মেরে ফেলবে। হাতে না হাতকড়া পড়ে।

পিপুলকে কেউ ডাক-খোঁজ করল না। আর বাড়িসুষ্ঠু লোক বেরিয়ে গেল পুকুরধারে, কী কান্ড হচ্ছে তা দেখতে। পিপুলেরই শুধু দেখতে ইচ্ছে হল না সে উঠোনের কুয়োতলায় গিয়ে কপিকলে বাঁধা বালতি ফেলে জল তুলল। তারপর হাতের কোষে জল ঢেলে গলা অবধি জল খেল।

মনটা ভালো ছিল না তার। বাপের সঙ্গে যদিও তার বিশেষ আদর-আশকারার সম্পর্ক নেই, তবু ওই লোকটা ছাড়া তার কে-ই বা আছে? দাদু কাকা সবাই তাকে মারে। মারে বাবাও। তবে কিছু কম। আর সে এটা জানে যে, দুনিয়ার কোনো রহস্যময় কার্যকারণে এই বাপ লোকটার সঙ্গেই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

বারান্দায় উঠতে তার সাহস হল না। সে কুয়োতলার পাশে একটা আতা গাছের ছায়ায় বসে রইল উবু হয়ে। বাইরে কী হচ্ছে তা দেখতে গেল না। শুনতে পেল, কোনো ঘরে একটা বাচ্চা খুব চেঁচিয়ে কাঁদছে। খুব কাঁদছে। বোধহয় চৌকি বা খাট থেকে পড়ে-উড়ে গেছে।

একটু অপেক্ষা করে পিপুল ওই বিকট কান্নাটা আর সহ্য করতে পারল না। উঠে পায়ে পায়ে সে এগোল। বারান্দায় উঠে যে-ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছিল সেই ঘরে উঁকি মেরে দেখল, চার-পাঁচ মাস বয়সের একটা বাচ্চা সত্যিই খাটের নীচে মেঝেয় পড়ে আছে। ইট দিয়ে বেশি উঁচু-করা খাট। বাচ্চাটা পড়ে কপাল ফাটিয়েছে, মুখ নীল হয়ে গেছে ব্যথায়।

পিপুল গিয়ে বাচ্চাটিকে তুলে বিছানায় শোয়াতে যাচ্ছিল, ঠিক এ সময়ে হুড়মুড় করে একটা বউ এসে ঢুকল। তার চোখ কপালে, মুখ হাঁ-করা চুল উড়ছে। ঢুকেই বিকট গলায়

চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই, অ্যাই, কী করছিলি এ ঘরে? অ্যাঁ, কী করছিলি? মেরে ফেলেছিস আমার ছেলেটাকে!

পিপুল বলল, না তো। এ পড়ে গিয়েছিল।

খপ করে বাচ্চাটাকে তার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে বউটা পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল, ওগো, দেখো কী সাংঘাতিক কান্ড! ঘরে ঢুকে বাচ্চাটাকে আছাড় মেরেছে...

আবার একটা চেঁচামেচি উঠল, লোকজন দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল।

তারপর যে কী কান্ড হল তা ভালো করে আজ আর মনে পড়ে না। শুধু মনে আছে, সবাই মিলে তাকে এমন মারতে লাগল চারধার থেকে যে সে চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে পড়ে গেল।

জ্ঞান ফিরল কুয়োর ধারে। কুয়োতলায় তাকে শুইয়ে জল ঢালা হচ্ছিল মাথায় আর গায়ে। সারা গা ভিজে সপসপে। জ্ঞান হতেই টের পেল তার মাথায় আর শরীরে ব্যথা আর জ্বলুনি। মাথার চুল বোধহয় কয়েক খাবলা উঠে গেছে। কান কেটে, কপাল ফেটে রক্ত পড়েছে। হাতে-পায়ে ঝনঝন করছে ব্যথা।

চোখ চেয়েই সে আতঙ্কের গলায় বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ি যাব।

সামনে সেই চোয়াড়ে লোকটা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো। তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখ। লোকটার পিছনে পাড়াসুদ্ধ লোক জড়ো হয়েছে।

কে একজন বলল, এ কি আপনার ভাগ্নে?

চোয়াড়ে লোকটা অর্থাৎ কালীপদ তেজের গলায় জবাব দিল, কীসের ভাগ্নে মশাই? ভাগ্নে ফাগ্নে এখন ভুলে যান। বাপ যেমন শয়তান, ছেলে তার চেয়ে কম যায় না। হরিপদর ছেলেটাকে আছাড় মেরে খুন করতে গিয়েছিল–চুরিটুরিরও মতলব ছিল বোধহয়।

সেই লোকটা বলল, সে যাই বলুন, কাজটা আপনারা ভালো করছেন না। বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এর বাপকে তো হাসপাতালে পাঠালেন। যা মার মেরেছেন তাতে ফিরলে হয়। তার ওপর এই একফোঁটা ছেলেটাকে হাটুরে মার দেওয়া হল, আপনারা তো পাষন্ড মশাই।

কালীপদ এ কথায় লাফিয়ে উঠে লোকটার দিকে তেড়ে গেল, ওঃ, খুব যে দরদ দেখছি। যখন এর বাপ আমার বোনটাকে গলা টিপে মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তখন কোথায় ছিলেন?

কালীপদ যে গুন্ডা লোক তা বোঝা গেল সেই প্রতিবাদকারী চুপ করে যাওয়ায়।

কালীপদ বলল, দরদি ঢের দেখা আছে। বেশি ফোপরদালালি করতে এলে মজা বুঝিয়ে দেব।

পিপুল আতঙ্কিত চোখে চারদিকে চেয়ে দেখছে। এরা তাকে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না। উঠে একটা দৌড় লাগাবে? কিন্তু শরীর এমন নেতিয়ে পড়েছে যে, উঠে দাঁড়ানোর সাধ্যই নেই!

কালীপদ তার দিকে কটমট করে এমন চেয়েছিল যে পিপুলের রক্ত জল হওয়ার উপক্রম। মারের চোটে ইতিমধ্যেই সে প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলেছে। আর তার ভীষণ জলতেষ্টা পাচ্ছে।

কালীপদ কড়া গলায় বলল, এবার বলবি তোর মতলবখানা কী ছিল?

পিপুল কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আর কখনো আসব না।

কিন্তু এসেছিলি কেন?

আমি আসতে চাইনি। বাবা জোর করে এনেছিল।

কালীপদর চোয়ালটা আবার শক্ত হল। বোধহয় আরও একটা চড় মারার জন্যই হাতটা তুলেছিল সে। এমন সময় বারান্দা থেকে একজন বুড়ি চেঁচিয়ে বলল, ওরে ও কালী, এরপর মানুষ-খুনের দায়ে পড়বি যে! অনেক হয়েছে। এটা গেরস্তবাড়ি, রাজ্যের লোক ঢুকে পড়েছে তামাশা দেখতে। ওসব হুড়যুদ্ধ এবার বন্ধ কর বাবা। ওই একফোঁটা ছেলেটাকে আর কত মারবি।

কালী চড়টা মারল না। তবে আরও কিছুক্ষণ তড়পাল। তারপর চাকর গোছের একটা লোককে ডেকে বলল, অ্যাই গোপলা, এটাকে নিয়ে চোরকুঠুরিতে পুরে রাখ। খবর্দার, কিছু খেতেটেতে দিবি না। জল অবধি নয়।

তার মামাবাড়ি পুরোনো আমলের। হয়তো একসময়ে অবস্থা খুবই ভালো ছিল। মাটির নীচে মেটে জলের জালা রাখার মস্ত ঘর আছে। গোপাল তাকে ধরে নিয়ে সেই অন্ধকার পাতাল ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ভারি স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। ঘুটঘুট্টি অন্ধকারও বটে। পিপুল শরীরে মারের যন্ত্রণা নিয়ে সেখানে মেঝেয় পড়ে কাঁদতে লাগল। পেটের খিদে, গলার তেষ্টা তো ছিলই। আর ছিল অপমান আর লাঞ্ছনা। নিজের বাড়িতেও তার আদর নেই বটে, কিন্তু সেখানে এই হেনস্থা তার কখনো হয়নি।

কাঁদতে কাঁদতে পিপুল অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেলা কত হল, দিন গিয়ে রাত এল কিনা সে জানে না, তবে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখল, তার সামনে লণ্ঠন হাতে একটা বুড়ি দাঁড়িয়ে। সেই বুড়িটাই যে তাকে আর মারতে কালীপদকে নিষেধ করেছিল।

বুড়ি বলল, তুই কি পিপুল?

পিপুল ভয়-খাওয়া গলায় বলে, হ্যাঁ।

আমি তোর দিদিমা, জানিস?

দিদিমা-টিদিমা পিপুলের কাছে কোনো সুখের ব্যাপার নয়। সে বুঝে গেছে মামাবাড়ির পাট তার চুকে গেছে। সে ফুঁপিয়ে উঠে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, আপনাদের পায়ে পড়ি।

তুই কি বাচ্চাটাকে সত্যিই আছাড় মেরেছিলি?

পিপুল সবেগে মাথা নেড়ে বলল, না, আছাড় মারব কেন? বাচ্চাটা খাট থেকে পড়ে গিয়ে ভীষণ কাঁদছিল, আমি গিয়ে কোলে নিয়েছিলাম।

দিদিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তাই হবে। তোর কপালটাই খারাপ। ছোটো বউ এমন চেঁচামেচি করল যে সকলে ধরে নিল, আছাড় মেরে ছেলেটাকে তুই মেরে ফেলতে চেয়েছিলি। এ বাড়িতে যে কী অশান্তি রে ভাই, কী আর বলব! খুব মেরেছে তোকে, না?

পিপুল এসব আদুরে কথায় আর বিশ্বাস করে না। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, নাকে খত দিচ্ছি, আর আসব না কখনো।

ছেড়ে দেবেটা কে? কালীপদকে তো চিনিস না! কুরুক্ষেত্র করবে। এখন ও বাড়িতে নেই। ফিরতে রাত হবে। কোন মূর্তি নিয়ে ফিরবে কে জানে বাবা!

এ-কথা শুনে পিপুল ফের কাঁদতে লাগল। মনে হচ্ছিল, এই পাতালঘর থেকে আর সে কোনো দিন বেরোতে পারবে না। কাঁদতে গিয়ে দেখল তার হিক্কা উঠছে। মাথা ঝিমঝিম করছে।

দিদিমা উবু হয়ে তার কাছে বসে গায়ে হাত দিয়ে বলল, শোন ভাই, এ বাড়িতে আমিও বড় সুখে নেই। দিন-রাত ভাজা-ভাজা হচ্ছি, কেন যে প্রাণটা আজও ধুকপুক করছে তা বুঝি না। সংসার তো নয়, আস্তাকুঁড়!

আমি বাড়ি যাব।

আমাদের ক্ষমতা থাকলে কি এ সংসারে এভাবে পড়ে থাকতুম!

আমি তো বাচ্চাটাকে ফেলিনি। কিছু তো চুরিও করিনি। তবে কেন আমায় আটকে রাখছেন?

তোর দোষ নেই জানি। কিন্তু তোর বাবা বড্ড খারাপ যে, ওর জন্যই তো মেয়েটা মরল। তাই তোদের ওপর সকলের রাগ। বেঁচে যখন ছিল তখনও বাপের বাড়িতে আসতে দিত না।

আমাকে কি আপনারা আরও মারবেন? আর মারলে কিন্তু আমি মরেই যাব। দিদিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সবই ভবিতব্য রে ভাই। মারলেও কী আটকাতে পারব! আমার কথা কে শুনবে বল!

পিপুলের কান্না থামছিল না। ভয়ে বুকটা বড্ড দুরদুর করছিল। আরও মারবে? কিন্তু কেন মারবে সেটাই যে সে বুঝতে পারছে না!

দিদিমা তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে বলল, শোন ভাই, এখন যদি তোকে ওপরে নিয়ে যাই তাহলে সবাই দেখতে পাবে। কথাটা কালীরও কানে যাবে। তুই বরং মটকা মেরে পড়ে থাক, আর একটু রাত হলে আমি চুপিচুপি আসবখন।

আমার যে বড্ড ভয় করছে!

এই লণ্ঠনটা রেখে যাচ্ছি। এখানে ভয়ের কিছু নেই। এ ঘরটা বেশ পরিষ্কার আছে। তোর কি ভূতের ভয়?

না, আমার এমনিই ভয় করছে।

এইটুকু তো তোর বয়স, ভয় তো করবেই। তবু আর একটু কষ্ট কর দাদা। বেশিক্ষণ নয়। এ বাড়ির সবাই রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। শুধু ভয় কালীপদকে। তার একটু রাত

হয় শুতে। তাই চুপটি করে পড়ে থাক। আর এই জলের ঘটিটা রাখ, আর দুটো বাতাসা। চুপটি করে এনেছি। ওদিকে একটা জালা আছে, ঘটিটা ওর পিছনে লুকিয়ে রাখিস।

দিদিমা চলে গেল। পিপুল তার প্রচন্ড তেষ্টা মেটাতে জল খেতে গিয়ে বিষম খেল। তারপর সবটুকু জলই প্রায় খেয়ে ফেলল। তারপর বড়ো বড়ো চারখানা বাতাসা চিবোল গোগ্রাসে। জীবনে যেন এত সুস্বাদু খাবার সে আর খায়নি।

খানিক জেগে, খানিক ঘুমিয়ে কতটা সময় পেরোল কে জানে! তবে এক সময়ে তার অপেক্ষা শেষ হল। ওপরে দরজা খোলার মৃদু শব্দ পেল সে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, শুধু দিদিমা নয়-দাদুও।

দিদিমা বলল, কী মার মেরেছে দেখছ ছেলেটাকে!

দাদু গম্ভীর গলায় বলল, দেখেছি। কী আর করা যাবে বলো, আমাদের তো কিছু করার ছিল না।

এখন কী করবে?

কিছু করতে যে সাহস হয় না।

তা বলে চোখের সামনে দুধের ছেলেটাকে মরতে দেখব নাকি? শত হলেও নিজের নাতি। আমাদের আর ভয়টা কীসের বলো। বেঁচে থেকেও তো মরেই আছি।

দাদু চিন্তিত মুখে পিপুলের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, একেবারে মায়ের মুখের আদল, দেখেছ?

দিদিমা ঝংকার দিয়ে বলল, আমি কী ছাই চোখে ভালো দেখি! তিন বছর হল ছানি পড়ে চোখ আঁধার হয়ে আছে। সব কিছু যেন কুয়াশায় ডোবা, আবছা আবছা। ওরে ভাই, তোর নাম তো পিপুল?

পিপুল চিঁ চিঁ গলায় বলল, হ্যাঁ।

আমাদের সঙ্গে আয়, চাট্টি ভাত খাইয়ে দিই। খিদে পায়নি তোর?

পিপুলের চোখে ভাতের কথায় জল এল। মাথা নেড়ে বলে, আমার কিছু চাই না। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ি যাব।

দিদিমা আক্ষেপ করে বলে, ওরে, আমাদের কপাল যদি ভালো হত তাহলে বলতে পারতুম যে, এটাও তোর বাড়ির মতোই। মামাবাড়ি কী ফেলনা নাকি? কত আদর মামাবাড়িতে! তা ভাই, কপালটাই যে আমাদের ঝামা পোড়া। এখন আয় দেরি করিসনি। দেরি করলেই বিপদ। শুধু তোর নয়, আমাদেরও।

এত ভয়ের ওপর ভয়ে পিপুল সিঁটিয়ে যাচ্ছিল। ভাত খাবে কী, তার শরীর এত কাঁপছে যে মনে হচ্ছে জ্বর এসেছে বুঝি। তবে এই অন্ধকার চোরকুঠুরি থেকে বেরোনোর জন্যই সে ভাত খেতে রাজি হল। দাদু আর দিদিমা চুপিসাড়ে তাকে ওপরে নিয়ে এল। বারান্দার এক প্রান্তে রান্নাঘর। বাড়ি নিঝুম। কত রাত তা জানে না পিপুল। তবে রাত বেশ গভীর বলেই মনে হল তার। উঠোনে একটা কুকুর তাকে দেখে ভেউ-ভেউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

দাদু তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে চাপা ধমক দিল কুকুরটাকে, অ্যাই, চোপ!

কুকুরটা লেজ নাড়তে লাগল।

রান্নাঘরে তাকে পিঁড়িতে বসিয়ে একটা থালায় ভাত বেড়ে দিল দিদিমা। বেশ তাড়াহুড়োর ভাব। বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে ভাই।

পিপুলের বিশাল খিদে মরে গেছে অনেকক্ষণ আগে। এখন তার একটা বমি-বমি ভাব হচ্ছে। দু-তিন গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে সে কেবল জল খেতে লাগল ঢকঢক করে। জল খেয়েই পেট ভরে গেল। আর কেমন শীত করতে লাগল।

কিছু একটা সন্দেহ করেই দিদিমা তার কপালে হাত দিয়ে বলল, ইস, তোর যে জ্বর এসেছে দেখছি! গা পুড়ে যাচ্ছে।

পিপুলের খুব ঘুম পাচ্ছে। আর শুধু জলতেষ্টা

দিদিমা গিয়ে দাদুকে ডেকে এনে বলল, ছেলেটার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, কী করবে?

দাদু চিন্তিতভাবে বলে, অনেক ক্ষত হয়েছে দেখছি। কেটেকুটে বিষিয়ে গেছে। ব্যথার তাড়সে জ্বর।

তোমার হোমিও চিকিৎসায় হবে না?

হবে না কেন? তবে চোর-কুঠুরিতে রাখলে আজ রাতেই মরে যাবে। ওকে আমাদের ঘরে নিয়ে ঢেকেঢুকে শোওয়াও। আমি চারদিকটা দেখে নিয়ে আসছি।

অনেকক্ষণ বাদে এই প্রথম পিপুল তার জ্বরঘোরেও বুঝতে পারছিল, এ পৃথিবীতে এখনও দুটি মানুষ অবশিষ্ট আছে যারা তাকে একটু-আধটু মায়া করে।

পিপুলকে ধরে তুলল দিদিমা। তারপর দাদুকে বলল, শোনো, এই ছেলে নিয়ে অনেক গন্ডগোল হবে। কালী এসে কুরুক্ষেত্র করবে। তুমি একবার গৌর মিত্রের কাছে যাও এখনই। তাকে সব বলো গিয়ে।

দাদু একটু যেন ভয় খেয়ে বলে, গৌর মিত্তির। বলো কী? গৌর রগচটা লোক, খুনোখুনি করে ফেলতে পারে! শত হলেও কালী আমাদের ছেলে!

দিদিমা খুব শান্ত গলায় বলে, ছেলে আমারও কিন্তু আমি তার মা হয়েও বলছি, গৌর মিত্তিরকে একটা জানান দিয়ে রাখো। সে ষন্ডাগুন্ডা হতে পারে, কিন্তু দশজনের উপকারও করে। আমরা বুড়োবুড়ি পেরে উঠব না, কালী এ ছেলেকে মেরে তবে ছাড়বে।

দাদু একটু দোনোমোনো করে বলল, তাই যাচ্ছি। তুমি একে ভালো করে ঢেকে শোওয়াওগে। আমি আসছি।

দিদিমা পিপুলকে দোতলার একখানা ঘরে নিয়ে এল। বেশ বড়ো ঘর। মস্ত খাট পাতা। মশারি ফেলা। সেই খাটের বিছানায় তাকে শুইয়ে একটা কাঁথা চাপা দিয়ে বলল, ঘুমো–ভয় নেই। তোর জন্যই বোধহয় আজও অবধি আমরা বেঁচে ছিলাম। আমাদের প্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ মরবি না। ঘুমো তো ভাই।

পিপুলকে আর বলতে হল না। নরম বিছানা পেয়েই তার শরীর অবসন্ন করে এক গাঢ় ঘুম ঢেকে ফেলল তাকে।

মাথার দিককার মস্ত জানালা দিয়ে যখন ভোরের লালচে রোদ এসে বিছানা ভরে দিল তখন চোখ চাইল পিপুল। বিছানায় সে একা। তার দুধারে দাদু আর দিদিমা যে রাত্রে শুয়েছিল তা বালিশ আর বিছানা দেখেই সে টের পেল। দেখতে পেল তার শরীরে কাটা আর ফাটা জায়গাগুলোয় তুলো আর ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। তা বলে ব্যথা সে কিছু কম টের পাচ্ছিল না। জ্বরের একটা রেশ শরীরে রয়েছে এখনও। আর বড্ড তেষ্টা।

বাড়িটা নিস্তব্ধ। কোনো গোলমাল বা চেঁচামেচি নেই। তবু কান খাড়া করে রইল পিপুল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। বিছানা ছেড়ে ধীরপায়ে গিয়ে জানলায় দাঁড়াল। এটা পুব দিক। সামনেই সেই পুকুরটা। ওপাশে কিছু বাড়িঘর। তার ওপাশে সূর্য উঠছে। কী সুন্দর দৃশ্য! পুকুরের স্থির জলে ভোর আকাশের ছায়া।

দিদিমা পিছন থেকে হঠাৎ কথা বলে উঠতেই একটু চমকে গেল পিপুল।

উঠেছিস? দেখি গা-টা দেখি, কত জ্বর।

পিপুল কপালটা এগিয়ে দিল। তারপর চাপা গলায় বলল, কালীমামা ফিরেছে?

দিদিমা একটু হাসল, ফিরেছে। তোর ভয় নেই। রাত বারোটায় ফিরেই চোরকুঠুরির চাবি চাইল। দিইনি। নেশা করে আসে, অত বুদ্ধি কাজ করে না। তবু একটু চেঁচামেচি করেছিল ঠিকই। রাত সাড়ে বারোটায় গৌর মিত্তির এল। সে আসতেই সব ঠাণ্ডা।

গৌর মিত্তির কে দিদিমা?

দিদিমা বলে ডাকলি নাকি ভাই! সোনা আমার! গোপাল আমায়! কখন থেকে কানদুটো পেতে আছি, ডাকটা শুনব বলে।

ফোকলা মুখের হাসিটি এত ভালো লাগল পিপুলের। সে বলল, বললে না?

গৌর মিত্তির তো! তার কথা কী-ই বা বলি তোকে! সে ষন্ডাগুন্ডা লোক, সবাই তাকে ভয় খায়। চন্ডালের মতো রাগ। লোকের ভালোও করে, মন্দও করে। এখানে তার খুব দাপট।

সে এসে কী করল?

তোর দাদু গিয়ে তাকে সব খুলে বলেছিল। সে দেরি করেনি। তখন-তখনই চলে এসেছিল। কালী শুতে গিয়েছিল, তাকে তুলে এনে চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে গেল। আর তোর ভয় নেই। গৌর মিত্তির যখন আশ্রয় দিয়েছে, কালী আর ভয়ে কিছু করবে না!

কালীমামা কি খুব রাগী?

খুব। রাগ বলে নয় রে ভাই, রাগী মানুষ অনেক থাকে। সে হল বংশের কুড়ুল। অশান্তির শেষ নেই রে ছেলে।

আমি এখন কী করব দিদিমা? বাবা তো শুনেছি হাসপাতালে, কে আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবে?

বাড়িতে তোর তো ঠাকুর্দা আর কাকা আছে না? তারা তোকে দেখে-শোনে?

পিপুল চুপ করে রইল।

সেখানে তোর আদর নেই, না?

না।

তবে সেখানে গিয়ে কী করবি? এখানে থাকতে পারবি না?

এখানে! বলে আতঙ্কে চোখ বড়ো করে ফেলল সে।

দিদিমা দুঃখের গলায় বলে, থাকতে তো বলছি, কিন্তু এ বাড়িতে আমাদের কী আর জোর আছে? এখন বুড়োবুড়িকে পারলে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমাদেরই ঠাঁই নেই। তবু শ্বশুরের ভিটে আঁকড়ে আর বুড়োটার মুখ চেয়ে পড়ে আছি। এখানে কী আর শান্তিতে থাকতে পারবি? যদি শতেক অত্যাচার সয়ে থাকতে পারিস তবে হয়। যতদিন আমরা আছি তোকে আগলে রাখব।

আমার বড়ো ভয় করছে যে দিদিমা।

ভয় তো আমাদেরও করে। উমাপদমামাকে মনে আছে তোর?

না, আমার কাউকে মনে নেই।

না থাকারই কথা। আমার বড়ো ছেলে হল উমাপদ। সে ততটা খারাপ নয়, তবে ভাইদের অত্যাচারে সেও তিষ্ঠোতে পারেনি। স্টেশনের কাছে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। বিউটি বিচ্ছু হলেও উমাপদ কিন্তু ভালো। তার কাছে থাকবি?

পিপুল মাথা নেড়ে বলে, আমি এখানে থাকব না, বাড়ি যাব।

বাড়িতেও তার আদর নেই বটে, কিন্তু সেখানে অবস্থা এতটা খারাপ নয়। মামাবাড়িতে এসে তার মনে হচ্ছে, তাদের চেয়েও ঢের ঢের খারাপ অবস্থায় লোকে দিব্যি আছে। বাড়ি

তার চেনা জায়গা। বাড়িতে আদর না থাক, পাড়াভরতি, স্কুলভরতি তার কত বন্ধু। পালিয়ে থাকার কত জায়গা।

দিদিমা আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই যদি যাবি ভাই, তবে তাই যাস। উমাপদ গিয়ে দিয়ে আসবেখন। ওদিকে তো আর এক সর্বনাশের কথা শুনছি! জামাইকে মেরে পাটপাট করেছে, পুলিশ আসতে পারে!

বাবার সঙ্গে পিপুলের তেমন ভাবসাব নেই। তেমন টানও নেই বাবার ওপর। তবু একটু কষ্ট হচ্ছিল বাবার জন্য। মামাবাড়িটা যে ভারি বিপদের জায়গা আর কালীমামা যে সাংঘাতিক লোক এটা সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

দিদিমা বাসি রুটি আর গুড় এনে দিল। সকাল বেলায় সে রাক্ষুসে খিদে টের পাচ্ছিল। পেট ভরে খেল। শরীরে হাজারো ব্যথা, ভীষণ দুর্বল। খাবারটুকু খেয়ে শরীরে যেন একটু জোর পেল।

দিদিমা সাবধান করে দিয়ে বলল, আমার ওদিকে অনেক কাজ। তোর দাদু গেছে এজমালি পুকুরে, সেখানে আজ মাছের বাঁটোয়ারা হবে। তোর ঘর থেকে বেশি বেরোনোর দরকার নেই। চুপচাপ পড়ে থাক বিছানায়। ওরা ধরে নেবে তোর এখনও অসুখ।

দিদিমা দরজা ভেজিয়ে চলে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ সত্যিই মটকা মেরে পড়ে রইল পিপুল। কিন্তু সে নিতান্তই বালক। তার পক্ষে এভাবে অসময়ে শুয়ে থাকা তো সম্ভব নয়। সে ছটফট করছে, বারবার উঠে বসছে। পেচ্ছাপ পেয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু কোথায় সেটা করা যায় তা বুঝতে পারছে না।

দিদিমা আর এ ঘরে আসছে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে আর না পেরে ভেজানো দরজা খুলে বেরিয়ে এল বিপুল। লম্বা দরদালান হাঁ-হাঁ করছে ফাঁকা। কিন্তু কোনোদিকে কোনো কলঘর নেই। পেচ্ছাপ পাওয়াটাই একটা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল পিপুলের কাছে। দরদালানের জানালা দিয়ে সাবধানে উঁকি দিয়ে সে দিদিমাকে খুঁজল। নীচে বড়ো

উঠোন। কুয়োতলায় দু-জন ঝি বাসন মাজছে, একজন লুঙ্গিপরা লোক দাঁতন করছে পেয়ারাতলায় দাঁড়িয়ে। পিছনদিকে গোয়ালঘরের সামনে দুটো গোরু মাটির গামলা থেকে জাবনা খাচ্ছে একমনে। দিদিমাকে কোথাও দেখা গেল না।

যে লোকটা দাঁতন করছে সে কে তা জানে না পিপুল। এ তার আর একজন মামা নয় তো! মামাদের বড়ো ভয় খাচ্ছে সে। পিপুল লক্ষ করল, কুয়োতলার ওধারে একটু জংলা জায়গা আছে। ওখানে পেচ্ছাপ করে আসা যায়। কিন্তু কে কী বলবে কে জানে! ভরসা এই, এখনও বেলা হয়নি। বাড়ির সবাই বোধহয় ঘুম থেকে ওঠেওনি। ক্ষীণ একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কালকের সেই বাচ্চাটাই কী?

পিপুল খুব সাহস করে সিঁড়ি দিয়ে খুব আস্তে আস্তে নামতে লাগল। বুক দুরদুর করছে, গলা শুকিয়ে আসছে। এরকম অদ্ভুত ভয়-ভয় এর আগে তার কখনো হয়নি। নীচের দরদালানে সিঁড়িটা যেখানে ঘুরে নেমে গেছে সেখানকার চাতালে দাঁড়িয়ে সাবধানে রেলিং এর ওপর দিয়ে দেখে নিল সে। একজন বউমতো মানুষ একেবারে ওধারে বসে কুটনো কুটছে। বউটি তাকে হয়তো দেখতে পাবে না, কিন্তু উঠোনের দাঁতনওলা লোকটা পাবে।

কিন্তু পিপুলের আর উপায় নেই। সে সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে নেমে দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠোনে নেমে পড়ল। দাঁতনওলা লোকটার দিকে তাকালই না পিপুল। একরকম তার নাকের ডগা দিয়েই একছুটে গিয়ে কচুবনের মধ্যে বসে পড়ল।

ওটা কে রে ঝিকু? একটা হেঁড়ে গলা হেঁকে উঠল।

যারা বাসন মাজছিল তাদের একজন বলল, ওই তো তোমাদের বোনের ছেলে, যাকে নিয়ে কাল অত হাঙ্গামা হল!

কিন্তু এ তো দিব্যি ছুটে গেল দেখছি! শুনলুম যে সাংঘাতিক জ্বর! মা বলছিল।

তা জ্বর হতেই পারে বাপু। যা মার মেরেছ ওকে তোমরা। ওরকম মারের তাড়সে জ্বর হবে না তো কী! ওইটুকু তো ছেলে!

বেশি ফটফট করিস না। কাল আমার ঘরে ঢুকে কী করেছে জানিস?

ঝিকু নামের ঝি-টা একটু সাহসী আর মুখ-আলগা। ঝঙ্কার দিয়ে বলল, ওসব বলে কি লোকের চোখে ধূলো দেওয়া যায়? ওইটুকু ছেলে খামোখা ঘরে ঢুকে তোমার বাচ্চাকে আছড়াবে কেন? বাচ্চা গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল, ও গিয়ে তুলেছে! তোমরা বাপু দিনকে রাত করতে পার।

হেঁড়েগলা বলল, চুপ করবি না কী? আমাদের ব্যাপার আমরা বুঝব!

তোমাদের ব্যাপার আবার কী? ভাগ্নে বলে তাকে মারবে এটাই কী নিয়ম নাকি?

পিপুলের পেচ্ছাপ হয়ে গেছে। সে ভয়ের চোটে কিছুক্ষণ বসে রইল এমনি। কিন্তু বেলাভর তো বসে থাকা যাবে না।

দাঁতনওলা লোকটা এইবার তার উদ্দেশেই একটা হাঁক মারল, এই ছোঁড়া, ওখানে কি করছিস, অ্যাঁ?

পিপুল উঠল। ঝিকুর জন্যই তার একটু সাহস হল। ঝিকুটা বোধহয় দজ্জাল। এরা বোধহয় ওকে একটু ভয় খায়।

এদিকে আয় তো! দাঁতনওলা ডাকল।

পিপুল খুব ভয়ে ভয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা হ্যাঁক থুঃ করে মুখ থেকে খানিকটা দাঁতনের ছিবড়ে ফেলে বলল, তোর নাকি জ্বর?

হ্যাঁ। কাল রাতে খুব জ্বর এসেছিল। আজ সকালে ছেড়েছে।

ঝিকু কুয়োতলা থেকে বলল, ইস মাগো! কী মার মেরেছে দেখো! সারা গায়ে কালশিটে –তোমরা মানুষ না কী গো!

লোকটা খুব কড়া চোখে তাকে দেখছিল। মুখখানাও চোয়াড়ে। যেন জীবনে কখনো হাসেনি। বলল, লম্পট আর মাতালের ছেলে–কত আর ভালো হবি। একটা সত্যি কথা কবুল করবি? তোর মাকে তোর বাবা খুন করেনি?

না, মা তো গলায় দড়ি দিয়েছিল।

সে তো গপ্পো। গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। বল তো সত্যি কি না?

পিপুলের চোখে জল এল। মা! মা থাকলে দুনিয়াটা কী এরকম হত? এত মারতে, অপমান করতে পারত কেউ?

সত্যি কথা তোর মুখে আসবে না জানি। এবার বল তো, তোর বাবা তোকে কেন এ বাড়িতে ঢুকিয়ে নিজে আড়ালে লুকিয়ে বসেছিল?

ঝিকু বালতিতে জল তুলতে তুলতে বলল, ওসব কথা তুলছ কেন? মশা মারতে তো কামান দেগে বসে আছ! চারদিকে তোমাদের নিয়ে কথা হচ্ছে! ছেলেটাকে মেরেছ, বাপটাকে প্রায় খুন করে ফেলেছ–কোমরে দড়ি পড়ল বলে।

তুই চুপ করবি?

ঝিকু মাঝবয়সি মজবুত চেহারার মহিলা। গায়ের রং ঘোর কালো, দাঁত উঁচু, কপালে আর সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর। হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বলল, আমাকে অত চোখ রাঙিও না। মাসকাবারে চল্লিশটা টাকা দাও বলে মাথা কিনে নাওনি!

এ কথায় লোকটা একটু মিইয়ে গেল যেন। বলল, তুই ঘরে যা। আমি আসছি। পিপুল ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে ঘরে এসে খাটে বসে রইল। তার দুর্গতি যে কেন শেষ হচ্ছে না তা সে বুঝতে পারছে না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে লোকটা হাতে এক কাপ গরম চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। কাঠের চেয়ারটায় জুত করে বসে বলল, দিদিমার খুব আশকারা পাচ্ছিস, না?

পিপুল কিছু বলল না, চেয়ে রইল।

কাল অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের রাগ এখনও যায়নি।

পিপুল একটু সাহস করে হঠাৎ বলল, আমি তো কিছু করিনি।

আলবাত করেছিস। তোকে দিয়ে তোর বাপ কিছু করাতে চেয়েছিল। নইলে তার এত সাহস হয় না যে এ তল্লাটে আসবে!

সেটা আমার বাবা জানে।

তুইও জানিস। পেট থেকে কথা বার কর ভালো চাইলে।

কে জানে কেন, হঠাৎ পিপুলের একটু সাহস এল। সে হঠাৎ লোকটার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, আপনারা আমার বাবাকে কেন মেরেছেন? আমাকে কেন মেরেছেন? মারলেই হল!

লোকটা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। চমকে যাওয়ায় চা-ও খানিক চলকে পড়ল। খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না।

পিপুলের সাংঘাতিক রাগ হল এবার। লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে সে বিকট গলায় বলল, আপনারা ভীষণ খারাপ লোক। খুব খারাপ লোক।

আমরা খারাপ লোক! বলে লোকটা হাঁ করে রইল। তারপর হঠাৎ উঠবার একটা চেষ্টা করে বলল, তবে রে! তোর এত সাহস!

কী হল কে জানে, লোকটা উঠতে গিয়ে প্রথমে চেয়ারটা ফেলল দড়াম করে, তারপর চা সামলাতে গিয়ে নিজেও টাল খেয়ে একেবারে চিৎ হয়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর। চায়ের কাপ ডিশ ভাঙল ঝনঝন করে। এই কান্ড দেখে ঠাণ্ডা হয়ে গেল পিপুল। সে কিছু করেনি।

লোকটা উঃ আঃ করে কাতর শব্দ করছিল। বিকট শব্দে নীচের তলা থেকে দুটি বউ, একজন পুরুষ কী হল, কী হল বলতে বলতে উঠে এল ওপরে। লোকটি সেই ভয়ঙ্কর কালীমামা।

লোকটি কোমর ধরে অতিকষ্টে উঠে বসে বলল, ওফ, মাজাটা গেছে।

কালীপদ চোখ পাকিয়ে বলল, এই ছোঁড়া তোকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বুঝি?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, না না, ও ফেলেনি। চেয়ারটা উলটে পড়ে গেল হঠাৎ।

লোকটা দাঁড়িয়ে মাজায় হাত বোলাতে লাগল।

কালীমামা একবার বিষদৃষ্টিতে পিপুলের দিকে চেয়ে নীচে নেমে গেল। বউ দুটোও ভাঙা কাপ ডিশ কুড়িয়ে মেঝের চা ন্যাকড়ায় মুছে নিয়ে চলে যাওয়ার পর চোয়াড়ে লোকটা হঠাৎ পিপুলের দিকে চেয়ে একটু হাসল। ঝকঝকে মজবুত দাঁত, আর হাসলে চোয়াড়ে মুখটাকে বেশ ভালোই দেখায়। লোকটা চেয়ারে বসে বলল, অমন রাগিয়ে দিতে আছে।

পিপুল কথাটার জবাব খুঁজে পেল না।

লোকটা মাঝে মাঝে কাতর শব্দ করছে। তার মধ্যেই বলল, আমি তোর সেজো মামা, বুঝলি?

পিপুল ঘাড় নাড়ে–বুঝেছি।

তা এখানেই বুঝি তোর থানা গাড়ার মতলব?

পিপুল মাথা নেড়ে বলে, না। আমি বাড়ি যাব।

হরিপদ তার দিকে ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বলে, বাড়ি যাবি? তার তত লক্ষণ দেখছি না! মা আর বাবা তো দেখছি নাতি পেয়ে হাতে চাঁদ পেয়েছে।

আমি বাড়ি যাব।

কেন, এ জায়গাটা কি খারাপ?

আমার ভালো লাগছে না।

হরিপদ এবার বেশ খুশিমনে একখানা হাসি হাসল, ওরে শোন বোকা, তেতো দিয়ে শুরু হলে খাওয়াটা শেষ অবধি ভালোই হয়। উত্তম মধ্যম খেয়ে শুরু করেছিস, তোর বউনি ভালোই হয়েছে। যতটা খারাপ ভাবছিস আমরা ততটা খারাপ নই। মেজদা একটু রাগচটা গুন্ডা লোক বটে। একটু সামলে থাকলেই হল। আমার দু-খানা ঘর আছে নীচে, আরামে থাকবি। ইস্কুলে ভরতি করে দেবখন। আমার বাচ্চাটাকে একটু রাখবি আর ফাইফরমাশ খাটবি একটু। পারবি না? বাড়ি গিয়ে কোন কচুপোড়া হবে?

পিপুল ছেলেমানুষ হলেও বোকা নয়। সে বুঝল, এ লোক ধড়িবাজ। তাকে বিনি-মাগনা চাকর রাখতে চায়। সে মাথা নেড়ে বলে, থাকলে দিদিমার কাছে থাকবে, আর কারো কাছে নয়।

আচ্ছা এখন জিরো, পরে দেখা যাবে।

এই বলে হরিপদ ক্যাকাতে ক্যাকাতে একটু নেংচে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

২. রণেশ ছবি আঁকে

রণেশ নীচের তলার ঘরে বসে ছবি আঁকে। বাঁ দিকের জানালা দিয়ে আলো আসে। জানালার পাশে একটু পোড়ো জমি। তার ওপাশে রাস্তা। জানালার ধারে একটা আতা গাছ আছে। আতা গাছ রণেশের খুব প্রিয়। ভারি সুন্দর এ গাছের পাতা। পৃথিবীর দৃশ্যমান যা কিছু সুন্দর তাই তার প্রিয়। সুন্দরের কোনো অভাব পৃথিবীতে মোটেই নেই। চারদিকে মনোযোগী চোখ ফেললে কত সুন্দরের দেখা পাওয়া যায়। রণেশের চোখে স্থায়ী এক রূপমুগ্ধতা আছে।

আজকাল সকালের দিকে জানালার ধারে একটা বাচ্চা ছেলে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ছবি আঁকার সময় কেউ চেয়ে থাকলে রণেশের কাজ এগোতে চায় না, অস্বস্তি হয়। তাই প্রথম দিন অ্যাই পালা বলে ধমকে দিয়েছিল। ছেলেটা কয়েকদিন আসেনি। দিনসাতেক বাদে আবার ছেলেটার কৌতূহলী মুখ জানালার দেখে রণেশ অবাক হয়ে বলল, কি চাস বল তো!

ছবি দেখছি।

ছবি দেখতে ভালো লাগে?

হ্যাঁ।

আঁকতে পারিস?

না তো!

রণেশ সেদিন ছেলেটাকে তাড়াল না, শুধু বলল, জানালার পাল্লার ওদিকটায় সরে দাঁড়া, নইলে তোর ছায়া এসে ছবিতে পড়বে।

ছেলেটা সন্তর্পণে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছবি আঁকা দেখল।

আজকাল প্রায়ই আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তারপর চলে যায়।

ছবি নিয়ে মস্ত জুয়া খেলেছিল রণেশ। চাকরি বা ব্যবসা না করে শুধু ছবি এঁকে সংসার চালানোর ঝুঁকি নিয়েছিল। বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক হওয়া সত্ত্বেও। কিছুদিন খুব কষ্ট গেছে। তবে তার ভাগ্য ভালো, সে নাম করল এবং বাজার পেল অত্যন্ত দ্রুত। কলকাতায় তার নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে, স্টুডিয়ো আছে। তবু কলকাতা থেকে একটু দূরে নিরুপদ্রবে নিরবচ্ছিন্ন ছবি আঁকার জন্য সে এখানে একটা বাড়ি কিনে নিয়েছে। এখানে সে বেশির ভাগ সময়েই একা থাকে, একজন কাজের লোক তার রান্নাবান্না সব করে দেয়। মাঝে মাঝে তার বউ-বাচ্চারা আসে এবং কয়েকদিন করে থেকে যায়।

রণেশ কয়েকদিন দেখার পর একদিন ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে, তোর নাম কি?

পিপুল ঘোষ।

কোন বাড়ির ছেলে তুই?

ওই রায় বাড়িতে থাকি। ওটা আমার মামাবাড়ি।

রায় বাড়ি? ওখানে তো খুব গন্ডগোল হয়েছিল কয়েকদিন আগে, তাই না?

হ্যাঁ।

তোর কে আছে?

শুধু বাবা, দাদু আর কাকিমা। মা নেই।

ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে?

পারি না যে।

কাল একটা কিছু এঁকে নিয়ে আসিস তো, দেখব। একটা কথা বলে দিই, কোনো ছবি দেখে নকল করিস না কিন্তু। যত খারাপ হোক মন থেকে আঁকবি।

পরদিন পিপুল একটা সাদা পাতায় পেনসিলে আঁকা যে ছবিটা নিয়ে এল তা একটা উড়ন্ত কাকের ছবি। বেশ ভালোই এঁকেছে। রণেশ খুশি হয়ে বলে, ছবির নেশা দেখেই বুঝেছি তোর ভেতরে আর্ট আছে। ঘরে আয়। ওধারে চুপটি করে বসে আঁকা দেখ। শব্দ করিস না।

শব্দ করেনি পিপুল। ছবির রাজ্যে কোনো শব্দ নেই, কোলাহল নেই। শুধু রূপের জগৎ খুলে যায় চোখের সামনে। নির্জন শব্দহীন ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে যে খেলাধুলো দুষ্টুমি ভুলে চুপ করে বসে থাকতে পারে এটা একটা সুলক্ষণ।

রণেশ ছবি আঁকতে আঁকতে মাঝে মাঝে কফি বানিয়ে খায়, কখনো-বা পায়চারি করে, কখনো চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকে। মাঝে মাঝে নিরবচ্ছিন্ন ছবি আঁকায় একটু-আধটু ফাঁক দিতে হয়।

এরকমই একটা ব্রেক নিয়ে আজ রণেশ ছেলেটার মুখোমুখি বসল। ছেলেটি বাচ্চা হলেও এই বয়সেই এর জীবন বেশ ঘটনাবহুল। সব মন দিয়ে শুনল রণেশ। ছেলেটা বড্ড গন্ডগোলে পড়েছে। বাবা হাসপাতালে, অস্তিত্ব অনিশ্চিত।

রণেশ জিজ্ঞেস করে, ইস্কুলে ভরতি হোসনি?

উদাস মুখে পিপুল বলে, মামারা কী আর পড়াবে!

পড়াবে না কেন?

আমার এখানে থাকাটাই তো পছন্দ করছে না। তাড়াতে চাইছে।

আমি যদি তোর স্কুলের খরচ দিই?

তাহলে পড়ব।

আরও বলে দিই, যদি ও বাড়ি থেকে তোকে তাড়ায়, তাহলে আমার কাছে এসে থাকতে পারিস। এ বাড়িতে তো জায়গায় অভাব নেই।

পিপুল এ কথায় খুশি হল। বলল, আমাকে থাকতে দেবেন? চুরি করব বলে ভয় পাবেন না তো?

রণেশ হাসল, এ বাড়িতে চুরি করার মতো কিছুই থাকে না। একমাত্র রং, তুলি আর ক্যানভাস ছাড়া। আর তোকে চোর বলে মনে হয়নি আমার। ওসব ভাবিস কেন!

পিপুল অবশ্য থাকল না। রণেশ তার স্কুলে ভর্তির টাকা দিল আর বই-খাতার খরচ। ছবি আঁকার কিছু সরঞ্জম দিয়ে বলল, খবর্দার, ছবি আঁকতে গিয়ে পড়াশুনোয় ফাঁকি দিস না, তাহলে কিন্তু দুটোই যাবে।

পিপুলের জীবন এইভাবে শুরু হল, নানা গন্ডগোলে, কিন্তু থেমে রইল না। রণেশ ছবি আঁকে বলেই বাস্তব জগতের অনেক কিছু মাথায় রাখতে পারে না। কিন্তু পিপুলের মুখ দেখে সে ঠিক বুঝতে পারে কবে এর খাওয়া হয়নি, কবে এ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে বা মারধর খেয়েছে।

মামাবাড়িতে পিপুলের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। দাদু আর দিদিমা তাকে আগলে রাখে বটে, কিন্তু তারা সব কিছু ঠেকাতে পারে না। মামারা নানাভাবে তাকে উৎখাত করতে চাইছে। বড় কারণ হল, এখনকার আইনে মামাবাড়িতে পিপুলের মায়েরও অংশ আছে। সুতরাং পিপুল যদি একদিন দাবি করে তাহলে বাড়ি আর সম্পত্তির অংশ তাকে দিতে হবে। তাছাড়া আছে তার মা আশালতার বেশ কিছু গয়না। আশালতা গলায় দড়ি দেওয়ার আগে সব গয়না তার মায়ের কাছে গচ্ছিত রেখে যায়। সে খবর মামা-মামিরা জানে। তক্কে তক্কে ছিল সবাই, সে সব গয়না ভাগজোখ করে নেবে। পিপুল মস্ত দাবিদার।

সে আসার পরে মামাবাড়িতে গন্ডগোল ঝগড়াঝাঁটি অনেক বেড়ে গেছে। সকলেরই লক্ষ্য হল দিদিমা আর দাদু। উপলক্ষ পিপুল। দাদু চুপচাপ মানুষ। দিদিমা কিছু বলিয়ে কইয়ে। কিন্তু মামা-মামিদের সমবেত ঝগড়ার সামনে দাঁড়াতে পারবে কেন? ভালোর মধ্যে শুধু পিপুলের গায়ে আর কেউ হাত তোলেনি।

প্রায় ছ-মাস বাদে এক সকালে পিপুলের বাবা হরিশচন্দ্র ঘোষের একটা হাতচিঠি নিয়ে একজন লোক এল। তাতে লেখা, পত্রপাঠ এই লোকটির সঙ্গে আমার ছেলেকে ফেরত পাঠাবেন। নইলে মামলা করব।

চিঠি নিয়ে আবার হইচই লাগল। মামা-মামিরা পিপুলকেই বিদায় করার পক্ষে। দিদিমার মত হল, হাতচিঠি পেয়েই অচেনা মানুষের হাতে নাতিকে ছেড়ে দিতে পারব না। তাতে যা হয় হোক।

কালীমামা লাফাতে লাগল, ছাড়বে না মানে? পরের ছেলে আটকে রেখে জেল খাটব নাকি সবাই?

জেল হলে আমার হবে, তোদের কী? পুলিশ এলে আমাকে ধরিয়ে দিস। এই বলে দিদিমা পিপুলকে কাছে টেনে ধরে রইল, পাছে ওকে কেড়ে নেয় ওরা।

হরিমামা কালীমামার মতো লাফালাফি করে না। সে মিটমিটে মানুষ। খুব মোলায়েম গলায় বলল, এখানেই বা ওকে কোন আদরে রেখেছি আমরা বলো! নিজের বাপের কাছে ওর তবু দাম আছে। যেমনই লোক হোক, ছেলেকে তো আর ফেলবে না।

যে লোকটা চিঠি নিয়ে এসেছে তাকে চেনে না পিপুল। তবে চেহারা দেখে মনে হয়, লোকটা সুবিধের নয়। রোগা, রগ-ওঠা চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখদুটো বেশ লাল। সে প্রথমটায় কথা বলছিল না, এবার এসব শুনে বলল, কাজটা খুব খারাপ করছেন আপনারা। হরিশচন্দ্রকে আপনারা মারধর করেছেন, তার জন্য খেসারত আছে। আবার ছেলেকে আটকে রাখছেন, এর জন্য দুনো খেসারত।

কালীমামা তিড়িং-বিড়িং করে উঠে বলল, কীসের খেসারত? হরিশচন্দ্র যা করেছে তাতে তার ফাঁসি হয়। আমাদের হাতে সে শুধু ঠ্যাঙানি খেয়ে বেঁচে গেছে। আর ছেলে? ছেলেকে তো সে-ই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে। তৈরি ছেলে, চুরি-চামারিতে পাকা হাত। অতি শয়তান।

লোকটা বারান্দায় ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসা, বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে বলল, মারধর বাবদ পাঁচটি হাজার টাকা গুনে না দিলে হরিশচন্দ্র আপনাদের শ্রীঘর ঘোরাবে, এই বলে রাখলুম। এ তল্লাটের মেলা সাক্ষী জোগাড় হয়ে গেছে। পুলিশেও সব জানানো হয়েছে। তবে মোকদ্দমায় না গিয়ে আপসে হয়ে গেলে হরিশচন্দ্র ঝামেলা করবে না। ওই পাঁচটি হাজার টাকা আর ছেলের সঙ্গে ওর মায়ের গয়নাগুলোও দেবেন। না হোক বিশ ভরি সোনা, কম কথা তো নয়।

কালী আর হরি একথা শুনে এত চেঁচাতে লাগল যে, অন্য কেউ হলে ভয় খেত। এ লোকটা পোক্ত লোক। পাকা বাঁশের মতো পোক্ত। একটুও ঘাবড়াল না। বলল, আমার হাতে টাকাটা না দেন, হরিশচন্দ্রর হাতেই দেবেন। সে স্টেশনে লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছে।

তবে রে! বলে কালীপদ তখনই স্টেশনে যাওয়ার জন্য ছুটে বেরোতে যাচ্ছিল।

হরিপদ তাকে আটকাল। বলল, আর ও কাজ করতে যাসনি। এবার বিপদ হবে। বরং দল বেঁধে গিয়ে আপসে কথা বলে আসাই ভালো।

লোকটা মিটিমিটি হাসছিল। বলল, আমাকে আপনারা চেনেন না। আমি হলুম শ্রীপদ মন্ডল। শ্রীরামপুর শহরে যে কাউকে নামটা একবার বলে দেখবেন, কপালে হাত ঠেকাবে। এটা আমার এলাকা নয় বটে, কিন্তু এ জায়গাতেও আমার যাতায়াত আছে। রেসো, নন্দু, কোকা সব আমার বন্ধু-মানুষ। আপনারাও নাম শুনে থাকবেন।

নাম সবাই শুনেছে। রেসো, নন্দু আর কোকা এ অঞ্চলের ষন্ডাগুন্ডা। কালীপদর মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল। কথা ফুটল না মুখে। তবে রাগে কাঁপছিল।

লোকটা তার দিকে চেয়ে বলে, এবার সুবিধে হবে না আপনার!

লোকটা কালীপদর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসিটি বজায় রেখেই বলল, আপনার এখন জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ।

কালীপদ হুংকার দিতে গিয়েছিল, হল না। গলাটা ফেঁসে গিয়ে মিয়োনো আওয়াজ বেরোল, তার মানে?

পুলিশে যদি কিছু না করে তাহলে আমি করব।

কী করবে?

ঘাড় নামিয়ে দেব। এই আপনার বাড়িতে বসেই বলে যাচ্ছি, টাকাপয়সা দিয়ে যদি মিটমাট না করেন, গয়না যদি ফেরত না দেন, তাহলে খুব বিপদ হয়ে যাবে।

কালীমামা ফের একটু তড়পানোর চেষ্টা করে বলল, মগের মুলুক পেয়েছ? বাড়ি বয়ে এসে চোখ রাঙানো, অ্যাঁ?

শ্রীপদ মন্ডল যে আত্মবিশ্বাসী লোক তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল এবার। মগজটি ঠাণ্ডা, মুখে একটা হাসির ভাব আছেই, কথাবার্তায় তেমন কিছু গরম নেই, গলাটি এবারও তুলল না। বলল, মশাই, আপনার তো কেবল তর্জন-গর্জনই দেখছি। আমি যা বলেছি সেটা একটু ঠাণ্ডা মাথায় বসে বিবেচনা করুন, তারপর আপনার যা ইচ্ছে করবেন। কিন্তু আমি যা বলি তা কাজেও করি, কখনো নড়চড় হয় না।

একথায় কালীমামার মুখে কুলুপ পড়ল। তার জায়গা নিল হরিমামা। বেশ মোলায়েম গলায় হরিমামা বলল, আমার দাদার মাথাটি কিছু গরম, নইলে লোক খুব খারাপ নন।

তা হরিশচন্দ্র একটা দাঁও মারতে চাইছে তাহলে! বলি কাজটা কী তার উচিত হচ্ছে? শত হলেও জামাই মানুষ, একরকম আত্মীয়ই তো?

শ্রীপদ মন্ডল ঠাণ্ডা গলায় বলল, সেটা আপনারা মনে রাখলেই ভালো হয়। আত্মীয় বলেই যদি বিবেচনা হয়ে থাকে তাহলে আত্মীয়কে কেউ লোক জুটিয়ে হাটুরে কিল দিয়ে হাসপাতালে পাঠায় নাকি!

সে যা হয়ে গেছে, গেছেই। মানুষ তো ভুল করেই। তবে কিনা আমাদের বোনটাকে ওভাবে খুন করাটাও তো হরিশচন্দ্রের ঠিক কাজ হয়নি।

খুন বলে প্রমাণ করতে পেরেছেন কি?

প্রমাণ করতে পারলে কী আর হাত গুটিয়ে বসে আছি রে ভাই! সে তো আর কাঁচা খুনী নয়। সব দিক বেঁধেছেঁদে কাজটি ফর্সা করেছে। সে বাবদে তো তার কাছ থেকে আমরা কানাকড়িটিও চাইনি। চেয়েছি, বলো?

এবার কী চাইতে ইচ্ছে করছে?

হরিপদ একটু হাসল। বলল, গয়নাগাটি আমাদের কাছে পাচার করবেটা কে? আমার বোনকে তো সে বাপের বাড়িতে আসতেও দিত না। ওই গয়না একটি একটি করে নিয়ে বন্ধক রেখে রোজ ফুর্তি করত। খুনটাও সেই গয়নার বাবদেই কিনা, সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার।

তার মানে আপনারা উপুড়হস্ত হচ্ছেন না?

তোমার সঙ্গে কততে রফা করেছে হরিশচন্দ্র?

রফাটফা কীসের মশাই। সে আমার বন্ধু-লোক।

হরিপদ ফের হেসে বলে, এটা কলিকাল কিনা, ওসব শুনলে ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। হরিশচন্দ্র যদি পাঁচ হাজার পায়, তবে তুমি তা থেকে না হোক আড়াইটি হাজার নেবে। তাই না?

শ্রীপদ একটা হাই তুলে বলল, হরিশচন্দ্র তো স্টেশনেই বসে আছে। কথাবার্তা তার সঙ্গেই গিয়ে বলে আসুন না। জেনে আসুন কার কত বখরা।

বাপু হে, টাকাটা যদি দিই তাহলে গলা বাড়িয়ে নিজের দোষ কবুল করা হয়। আমরা ও ফাঁদে পা দিচ্ছি না। তুমি আসতে পার।

কাজটা বোধহয় ভালো করলেন না মশাই। বলে শ্রীপদ উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, হরিশচন্দ্রের ছেলেকে আমি সঙ্গে নিচ্ছি না। ওর দিদিমার বড়ো মায়া ওর ওপর। তবে আপনারা যদি পৌঁছে দেন কখনো, দেবেন।

এই বলে শ্রীপদ মন্ডল বেশ দুলকি চালে চলে গেল।

হরিপদর সাহস দেখে সবাই অবাক। সন্ত্রস্ত কালীমামা বারবার বলতে লাগল, কাজটা ঠিক হল না–কাজটা ঠিক হল না। লোকটা মোটেই সুবিধের নয়।

উত্তেজিত কালীমামার হঠাৎ নজর পড়ল পিপুলের দিকে। পিপুল তার দিদিমার গা ঘেঁষে তখনও দরদালানের বাইরের বারান্দামতো জায়গাটায় দাঁড়ানো। কালীমামা পিপুলের ওপর চোখ পড়তেই শক-খাওয়া লোকের মতো লাফিয়ে উঠে বলল, ওই ছোঁড়াই যত নষ্টের গোড়া! আর মায়েরও বলিহারি যাই, একটা অজ্ঞাতকুলশীলকে একেবারে ঘরদোরে বিছানা অবধি নিয়ে তুলেছে! অ্যাই ছোঁড়া, এখনই বার হ বাড়ি থেকে!

দিদিমা তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। দিয়েই হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, তোকে যে এখন কোথায় রাখি দাদা। আমার মাথাটা বড় কেমন কেমন করছে।

বলতে বলতেই দিদিমা ঢলে পড়ল মেঝের ওপর। পিপুল তাড়াতাড়ি গিয়ে না ধরলে মেঝের ওপর পড়ে মাথাটা ফাটত।

ও দিদিমা! ও দিদিমা! বলে ডাকাডাকি করতে থাকে পিপুল।

দিদিমা একবার চোখ খুলে খুব ক্ষীণ গলায় বলে, বুকে ব্যথা হচ্ছে, তোর দাদুকে ডাক... পিপুল দিদিমাকে তুলে যে বিছানায় শোয়াবে ততখানি জোর তার শরীরে নেই। তবে বুদ্ধি করে সে মেঝের ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে বালিশ পাতল। তারপর দিদিমাকে গড়িয়ে নিয়ে সে মাদুরের ওপর শোওয়াল।

পিপুল চেঁচামেচি করল না, ঘাবড়েও গেল না। নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরোলো। নীচে অবশ্য চেঁচামেচি বন্ধ হয়েছে, কিন্তু দরদালানে খুব উত্তেজিত গলা পাওয়া যাচ্ছে কয়েকজনের। একটা লোক বাড়ি বয়ে এসে অপমান করে গেছে, ব্যাপারটা সহজ নয়। পাড়ার লোকজনও কিছু জুটেছে, আরও আসছে।

দাদুকে সিঁড়ির গোড়ায় পেয়ে গেল পিপুল। কানে কানে খবরটা দিতেই দাদু ফ্যাকাশে মুখে উঠে এল ওপরে। দিদিমার নাড়ি ধরেই বলল, গতিক সুবিধের নয়। তুই শিয়রে বসে মাথায় হাওয়া দে।

এক ডোজ হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিদিমার মুখে ঢেলে দিয়ে দাদু বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনল।

তারপর দিদিমাকে নিয়ে পরদিন সকাল অবধি যমে-মানুষে টানাটানি। পিপুলের দিকে কেউ নজর দিল না তেমন।

শেষরাতে পিপুল ঘুমিয়েছিল একটু, যখন চোখ চাইল তখন তার চোখের কোণে জল। ঘুমের মধ্যেও সে কেঁদেছে। বুক বড়ো ভার। ইহজীবনে এই দিদিমার কাছেই সে আদরের মতো একটা জিনিস পেয়েছিল কয়েকদিন। সেই আদরের দিন কী তবে ফুরোল?

দিদিমা অবশ্য মরল না। সামলে উঠল।

দুপুর বেলা দিদিমা তাকে ডেকে চুপিচুপি বলল, আমার মনে হয় এ যাত্রা আর খাড়া হব না। ঋণ রেখে যেতে নেই। ভালো করে শোন। ওই যে উঁচু কাঠের আলমারি দেখছিস, ওর মাথায় রাজ্যের ডাঁই করা বাজে জিনিস আছে। পুরোনো কৌটো, ন্যাকড়ার পুঁটুলি এইসব। খুঁজলে দেখবি ওর মধ্যে একটা পুরোনো বড়ো কৌটো আছে–তার মধ্যে তোর মায়ের গয়না।

গয়না দিয়ে কী হয় তা পিপুল জানে না। গয়না দামি জিনিস হতে পারে, কিন্তু তার কোন কাজে লাগবে? সে বলল, আমার গয়না চাই না দিদিমা, তুমি ভালো হয়ে ওঠো।

চাই না বললেই তো হয় না। জিনিসটা তোর। তবে ও নিয়ে বিপদে পড়বি। তোর দাদুকে ডাক, তাকে বলছি।

দাদু কাছেই ছিল, ডেকে আনল পিপুল।

দিদিমা অবসন্ন শরীরের হাঁফধরা গলায় বলল, গয়নার খবর ওকে দিয়েছি। তুমি ওগুলো বেচে ওর একটা ব্যবস্থা করে দিও।

দাদু হতাশ গলায় বলে, কী ব্যবস্থা করতে বলছ?

গয়নাগুলো বিক্রি করে যা টাকা পাবে সেটা ওর নামে ডাকঘরে রাখলে কেমন হয়?

ও তো এখনও ছোটো। গার্জিয়ান ছাড়া টাকা তুলতে পারবে না।

তোমরা পুরুষমানুষ, ভেবে একটা কিছু বের করো। ওর কাছে গয়না থাকলে হয় মামারা কিংবা ওর বাবা কেড়ে নেবে।

সে তো বটেই। তুমি অত হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন? মনটা শক্ত করো–বেঁচে উঠবে। ডাক্তার তেমন কোনো ভয় দেখায়নি।

ডাক্তাররা কী বোঝে আমার শরীরের ভিতরে কী হচ্ছে। যদি মরি তাহলে পিপুলের জন্য বড়ো অস্থির মন নিয়ে যাব। আমার মনটাকে একটু শান্ত করে দাও।

একটু ঘুমোও। আমারও নানা অশান্তিতে মাথা ভালো কাজ করছে না। তোমাকে সুস্থ করে তুলতে না পারলে আমার অবস্থা কী হবে একবার ভেবে দেখেছ?

দেখেছি। আমি গেলে এ সংসারে তুমি বড়ো বালাই। কিন্তু কী করব বল, ভগবানের ওপর তো আমাদের হাত নেই।

ওভাবে বোলো না, আমার বুকের জোর-বল চলে যায়। ডাক্তার তোমাকে বেশি কথা কইতে বারণ করেছে।

কথা কইতে হয় কী সাধে। এই শেষ কথা কটা না বলে নিলেই নয়–ঋণ রেখে মরা কী ভালো?

গয়না কত ভরি আছে?

সে কী আর জানি। কিছু গয়না জামাই ভেঙে খেয়েছে। বাকিগুলো রক্ষা করতে আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। যক্ষের মতো আগলে রেখেছি এতকাল। আর কী পারব? যার ধন তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এইবেলা।

আর কথা বোলো না। তোমার হাঁফ ধরে যাচ্ছে। গয়নার বিলিব্যবস্থা করব, চিন্তা কোরো না।

ডাক্তারকে আর ডাকতে হবে না। তুমি নিজেই বরং একটু করে হোমিও ওষুধ দাও। যা হওয়ার তাতেই হবে।

আমারও কী বুদ্ধি কাজ করছে এখন? হোমিওপ্যাথি করতে স্থির বুদ্ধি চাই। আমার তো হাত কাঁপছে। ফোঁটা বা বড়ি ফেলতে পারছি না। ওষুধও ঠিক করতে পারছি না।

ওতেই হবে। তুমি যা দেবে তাতেই আমার কাজ হবে।

আচ্ছা, তাই হবে।

দিদিমা চোখ বুজল।

পিপুলের পৃথিবী দিদিমার সঙ্গেই যেন আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারে, দিদিমা না বাঁচলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা বড়ো কঠিন হবে।

দিদিমা ঘুমোলে দাদু তাকে নিয়ে ছাদে এল। পায়চারি করতে করতে বলল, শুধু গয়না নয়, এ বাড়ি বা সম্পত্তিতেও তোর ভাগ আছে।

করুণ গলায় পিপুল বলে, ভাগ চাই না দাদু। এ বাড়িতে আমাকে কেউ দেখতে পারে না। আমি শ্রীরামপুরে ফিরে যাব।

দাদু মাথা নেড়ে বলে, সে যাস। তবু কথাগুলো তোকে বলে রাখলাম। দিদিমা তোকে বড়ো ভালোবাসে, এখনই যদি চলে যাস তবে বুড়ি বোধহয় হার্টফেল করবে। এখন কয়েকটা দিন কষ্ট করে থাক, তোর দিদিমা একটু সুস্থ হলে আমি নিজে গিয়ে তোকে শ্রীরামপুর স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে আসব।

এ প্রস্তাবে আপত্তি নেই পিপুলের। দিদিমা আর দাদুকে ছেড়ে যেতে তার যে খুব ইচ্ছে করছে তাও নয়। কিন্তু এ বাড়িতে তো থাকাও যায় না। বড়ো অশান্তি তাকে নিয়ে।

দিদিমা অবশ্য বেঁচে রইল। মরতে মরতেও শেষ অবধি মরল না। পরদিন সকাল বেলায় একটুক্ষণের জন্য উঠেও বসল এবং একটু দুধ খেল। ডাক্তার এসে দেখেটেখে বলল, হার্ট অ্যাটাক বলে ভেবেছিলাম। লক্ষণও তাই ছিল। তবে বোধহয় সিরিয়াস কিছু নয়। অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে।

দাদু একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বাঁচালে ডাক্তার। লক্ষণ দেখে আমার তো হাত পা হিম হয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার প্রেসারের যন্ত্র আর স্টেথস্কোপ গুছিয়ে ফেলে বলল, আপনাদের বাড়িতে কী একটা হাঙ্গামা হয়েছিল কাল। তাই না? ওরকম কিছু আবার হলে কিন্তু অ্যাটকটা রেকার করবে। কোনোরকম উত্তেজনা একদম বারণ।

আর ওরকম হবে বলে মনে হয় না।

তবু সাবধানে রাখবেন।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর দাদু দিদিমাকে বলল, নীচে শুনে এলাম, কাল রাতে নাকি স্টেশনে গিয়ে হরিপদ আর পাড়ার মাতব্বররা হরিশচন্দ্রের হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মিটমাট করে এসেছে।

দিল?

না দিয়ে উপায় কী? জামাই যা একখানা খুনে ঠ্যাঙাড়েকে পাঠিয়েছিল, ভয়ে সবাই জল! দুনিয়াটা হল শক্তের ভক্ত আর নরমের যম।

টাকাটা দিল কে?

কালীপদকেই দিতে হয়েছে। মারধরে সে-ই তো পান্ডা ছিল কিনা, তবে ভয়ে সে নিজে যায়নি। হরিপদ এসে নাকি বলেছে যে, জামাই আর তার দলবল সব স্টেশনেই মাইফেল বসিয়ে ফেলেছিল। সব নাকি মদে চুর। টাকা পেয়ে জামাই নাকি হরিপদর থুতনি নেড়ে চুমু খেয়ে বলেছে, যাও তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। আমার ছেলেটাকেও তোমাদের দান করে দিলাম। তার অযত্ন কোরো না, তাহলে ফের হাঙ্গামায় পড়ে যাবে।

দিদিমা চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সবই আমার কপাল। তবু নাতিটাকে তো রাখতে পারব। সেটাই আমার ঢের।

দেখো কতদিন রাখতে পার! টাকাপয়সা দিয়ে আপোশরফার ফল ভালো হয় না। টাকায় টান পড়লে জামাই ফের আসবে। ব্ল্যাকমেল বোঝো? এ হচ্ছে সেই ব্ল্যাকমেল।

কালী তার পাপের শাস্তি পাচ্ছে। আমরা কী করব বল।

৩. রণেশের সঙ্গে পিপুলের ঘনিষ্ঠতা

রণেশের সঙ্গে পিপুলের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠতে লাগল ছবি নিয়েই। ইস্কুল আর পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে রণেশের কাছে চলে আসে। ড্রয়িং শেখে, রঙের সঙ্গে রং মেশাতে শেখে, ক্যানভাসে তুলি চালাতে শেখে। রণেশ তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, খেলাধুলো করিস?

একটু-আধটু।

দুর বোকা! একটু-আধটু করলে হয় না। রীতিমতো শরীরচর্চা করতে হয়। আর্টিস্টের বেসিক স্বাস্থ্য হওয়া দরকার চমৎকার। স্বাস্থ্য ভালো হলে অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কাজ করতে পারবি, হাতে বা ঘাড়ে যন্ত্রণা হবে না, পিঠ টনটন করবে না। আরও কথা আছে। শিল্প হল বসে বসে কাজ। ব্যায়ামট্যায়াম না করলে ব্লাড-সুগার হয়ে যেতে পারে। দেখিসনি দ্য ভিঞ্চি বা পিকাসোর কেমন স্বাস্থ্য ছিল। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি তো কুস্তিগীর ছিলেন। ভালো আর্টিস্ট হতে হলে কোনো ব্যায়ামগারে ভরতি হয়ে শরীরটাকে ঠিক কর।

আর্টিস্ট হওয়ার জন্য পিপুল সব কিছু করতে রাজি। রণেশের কথায় সে একটা ব্যায়ামাগারে ভরতি হয়ে গেল। অখন্ড মনোযোগে ব্যায়াম করতে লাগল।

মামাবাড়িতে শান্তি নেই, কিন্তু গোটা বাড়ি একদিকে আর দাদু দিদিমা ও পিপুল আর একদিকে হওয়ায় সম্পর্কটা কম। মাঝখানে একটা গোলযোগ হয়ে গেল। মামারা এক বাড়িতেই হাঁড়ি ভাগাভাগি করে নিল। আর সেই গন্ডগোলে দাদু আর দিদিমাও মূল সংসার থেকে বাদ পড়ে গেল। দিদিমা দোতলার দরদালানে উনুন পেতে আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করে নিল। পিপুল যে রয়ে যেতে পারল, সেটাই বড়ো কথা।

পিপুল অখন্ড মনোযোগে পড়ে, একই মনোযোগে ব্যায়াম করে এবং ছবিও আঁকে। সে একটু একটু বুঝতে পারে, এ দুনিয়ায় তাকে ঠেকনো দেওয়ার মতো আপনজনের বড়োই

অভাব। দাদু আর দিদিমা তাকে যক্ষীর মতো আগলে থাকে বটে, কিন্তু তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। বাবা মাতাল এবং কাকা আর কাকিমার সংসারে তার অবস্থান অনিশ্চিত। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে একটু বড়ো হতে হবে। বড়ো না হলে এ দুনিয়াটার সঙ্গে যুঝতে পারবে না সে।

ইস্কুলে তার অনেক বন্ধু জুটে গেল। পাড়ায় জুটল। অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাজানা হল। যে লোকটা তাকে কালীমামার হাত থেকে প্রথম রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল সেই গৌর মিত্তিরের সঙ্গে তার দারুণ ভাব হয়ে গেল। কারণ গৌর মিত্তিরের আখড়াতেই সে ব্যায়াম শেখে। বাঘা চেহারা, দারুণ দাপট, প্রবল অহংকার। পিপুলের বুকে একটা প্রবল থাবড়া কষিয়ে একদিন বলল, শুধু চেহারা বাগালেই হবে না, ওতে শরীর সর্বস্ব হয়ে পড়বি। শুধু শরীর-শরীর করে স্বার্থপর, ভীতু আর বোকা হয়ে যাবি। সঙ্গে সাহস, স্বার্থত্যাগ এসবও চাই।

পিপুল করুণ গলায় বলে, ওসবের জন্যও কি আখড়া আছে?

গৌর হাঃ হাঃ করে খুব হাসল। বলল, তুই বেশ ত্যাঁদড় আছিস তো। বোকা তো নোস দেখছি! ব্যায়ামবীরদের বড় একটা সেন্স অফ হিউমার থাকে না-তোর আছে। খুব খুশি হলুম রে।

পিপুলও খুশি হয়ে বলে, আমি ওরকম মোটেই হতে চাই না। আমি ছবি আঁকব বলেই ব্যায়াম করছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ছবি আঁকাও খুব ভালো। গান গাইতে পারিস?

জানি না। কখনো গাইনি।

শুনতে ভালোবাসিস?

হ্যাঁ।

তাহলেই হবে। একখানা গা দেখি।

সন্ধ্যের পর ব্যায়ামাগার প্রায় ফাঁকা। শরৎকালে সন্ধ্যের পর একটু হিম পড়ছে। আদুড় গায়ে একটা তোয়ালে জড়িয়ে বেঞ্চের ওপর বসা গৌর মিত্তিরকে দেখলে বোম্বেটে বলে মনে হলেও লোকটা মোটেই ওরকম নয়। কিছুক্ষণ পিপুলকে অনুরোধ করেও যখন গাওয়াতে পারল না, তখন নিজেই খোলা গলায় একখানা রাগাশ্রয়ী শ্যামাসংগীত ধরে ফেলল গৌর মিত্তির। গাইতে গাইতে চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল।

পিপুল মুগ্ধ। বলল, আমাকে গান শেখাবেন?

শেখাব। তবে সব কিছু একসঙ্গে করতে যাস না–সব পন্ড হবে। কোনটা বেশি ভালো লাগে সেটা ভালো করে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখিস। যেটা বেশি ভালো লাগবে সেটাতেই জান লড়িয়ে দিবি।

পিপুলের জীবন শুরু হল ছবি, গান, শরীরচর্চা দিয়ে। জীবনের স্বাদ সে এই প্রথম পাচ্ছে। ছুটছাট গন্ডগোল মামাবাড়িতে লেগেই আছে বটে, কিন্তু পিপুল আর গ্রাহ্য করে না।

দিদিমা একদিন বলল, হ্যাঁরে দাদা, তুই যে বেশ জোয়ানটি হয়ে উঠলি। এই তো ছোট্টটি এসে হাজির হয়েছিলি গুটিগুটি!

সে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, খুব খাওয়াচ্ছ যে! পেটভরে এতকাল কী খেতে পেতুম?

আর একদিন আরও মজার একটা ঘটনা ঘটল। সন্ধ্যেবেলা ব্যায়ামাগার থেকে ফিরছিল পিপুল। বিকেলের আলো তখনও একটু আছে। বাড়ির সামনের পুকুরের ধারে কদম গাছের তলায় একজন লোক বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। পিপুল তাকে এক লহমায় চিনতে পারল। তার বাবা হরিশচন্দ্র। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, তার বাবা তাকে একদম চিনতে পারল না। বরং তাকে দেখে বলল, তুমি ও বাড়িতে যাচ্ছ ভাই?

পিপুল বাবাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। প্রশ্ন শুনে হাঁ হয়ে গেল। বলল, হ্যাঁ তো, কিন্তু...

আমাকে চিনবে না। ও বাড়িতে একটি ছোটো ছেলে আছে, তার নাম পিপুল–একটু ডেকে দেবে তাকে?

পিপুল এত অবাক হল যে বলবার নয়। কিন্তু সে একটু বাজিয়ে নেওয়ার লোভও সামলাতে পারল না। বলল, আপনি পিপুলের কে হন?

হরিশচন্দ্রের চেহারা অনেক ভেঙে গেছে। দু-গাল গর্তে, চোখ ডেবে গেছে। জামাকাপড়ের অবস্থাও ভালো নয়। হরিশচন্দ্র যে কিছু একটা মতলবে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। হরিশচন্দ্র বলল, বিশেষ কিছু হই না–দেশের লোক আর কী!

পিপুল তার বাবার কথা খুব জিজ্ঞেস করে, আপনি কী তার বাবার কাছ থেকে আসছেন?

হ্যাঁ, ওরকমই।

আপনি কি তাকে নিয়ে যেতে চান?

হরিশচন্দ্র মলিন মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। কোথায় নেব? আমার জায়গা নেই!

পিপুলকে কিছু বলতে চান?

হরিশচন্দ্র ইতস্তত করে বলে, একটা দুটো কথা ছিল। তা তাকে কি পাওয়া যাবে এখন?

যান না, ভিতরে চলে যান। সে দোতলায় থাকে।

হরিশচন্দ্রের সে সাহস হল না। জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, ভিতরে আর যাব না, এখান দাঁড়িয়েই দুটো কথা কয়ে নেব। সময় লাগবে না।

বাবার প্রতি পিপুলের তেমন কোনো আকর্ষণ কোনো দিনই ছিল না। বাবার জন্যই তার মা আত্মহত্যা করেছে। এই বাবার জন্যই সে নিজেদের বাড়িতে শতেক লাঞ্ছনা সহ্য

করেছে। এই বাবাই তাকে মামাবাড়িতে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল গয়নার লোভে। সুতরাং বাবার ওপর তার খুশি হওয়ার কারণ নেই।

সে বলল, কেন, ভিতরে যাবেন না কেন?

হরিশচন্দ্র থুতনি চুলকে বলল, না, আমার জামাকাপড় তো ভালো নয়। এ পোশাকে কী আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া যায়!

শ্বশুরবাড়ি কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। পিপুল হেসে ফেলল, বলল, এটা আপনার শ্বশুরবাড়ি নাকি?

হরিশচন্দ্র জিব কেটে বলল, না, ঠিক তা নয়। অনেক দূর-সম্পর্কের একটা ব্যাপার ছিল তো, তাই।

পিপুল নাটকটা আর বাড়াতে দিল না। একটু হেসে বলল, এতগুলো মিথ্যে কথা কেন বলছ বাবা? আমিই পিপুল।

এবার হরিশচন্দ্রের সত্যিকারের হাঁ হওয়ার পালা। এমন হাঁ করে রইল যেন ভূত দেখেছে। অনেকক্ষণ কথাই কইতে পারল না। তারপর বেশ ঘাবড়ানো গলায় বলল, তুই! সত্যিই তুই নাকি!

আমিই।

বয়ঃসন্ধির বাড়টা একটু তাড়াতাড়ি ঘটে। সেটা খেয়াল ছিল না হরিশচন্দ্রের। তা ছাড়া রোগাভোগা সেই পিপুল তো আর নেই। দু-বেলা তার খাওয়া জোটে। সে ব্যায়াম করে, খেলে, গান গায়।

হরিশচন্দ্রের বিস্ময়টা কাটতে সময় লাগল। তারপর বলল, আমি তোর কাছেই এসেছি, একটু কথা আছে।

কী কথা?

ওদিকপানে চল। আড়াল হলে ভালো হয়।

অপেক্ষাকৃত একটু নির্জন জায়গায় এসে হরিশচন্দ্র ছেলের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁরে, গয়নাগুলোর হদিস করতে পারলি?

কিসের গয়না?

দুর আহাম্মক! গয়নার জন্যই তো তোকে এখানে এনে হাজির করেছিলাম! তোর মায়ের গয়না-তোর দিদিমার কাছে গচ্ছিত আছে।

মায়ের গয়না? কেন? তুমি তা দিয়ে কী করবে?

হরিশচন্দ্র অতিশয় করুণ গলায় বলে, আমার চিকিৎসার জন্য টাকা চাই। ঘরে একটি পয়সাও নেই। বাড়িতে নানা গন্ডগোল, সেখানেও বেশিদিন থাকা যাবে না। বউ-বাচ্চা নিয়ে এখন কোথায় যাই বল!

এটা হরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় ভুল। সে যে বিয়ে করেছে এবং বাচ্চাও হয়েছে এ খবর মামাবাড়িতে এখনও পৌঁছোয়নি। হরিশচন্দ্র না বললে পিপুল জানতেও পারত না।

পিপুল জিজ্ঞেস করে, তুমি আবার বিয়ে করেছ নাকি?

হরিশচন্দ্র ফের জিব কেটে ভারি অস্বস্তির সঙ্গে মুখটা নামিয়ে বলল, কী করব সবাই ধরে বেঁধে দিয়ে দিল। আমার মোটেও ইচ্ছে ছিল না।

কবে করলে?

তুই চলে এলি–তা বছর তিনেক হবে না?

চার বছর।

এই তিন বছর হল, বন্ধুবান্ধবরা ধরে পড়ায় বিয়েটা করতে হল।

পিপুল বড্ড রেগে গেল লোকটার ওপর। তার ইচ্ছে হল, ধাঁই করে লোকটার নাকে একটা ঘুষি বসিয়ে দেয়। কিন্তু বাপ বলে কথা, ইচ্ছেটা দমন করে সে বলল, তুমি আমার মায়ের গয়না চাইতে এসেছ কেন? ও গয়না তো তোমার নয়?

হরিশচন্দ্র একটু খিঁচিয়ে উঠে বলে, আমার নয় তো কার? বিয়ের সময়ে পঁচিশ ভরি গয়না কড়ার করে বিয়ে হয়েছিল। বউয়ের গয়নার হক তার স্বামীর!

তাহলে গিয়ে নিজেই চেয়ে নাও।

হরিশচন্দ্র মিইয়ে গিয়ে বলে, আমাকে দিতে চাইবে না।

দিদিমার কাছে শুনেছি, তুমি মায়ের কিছু গয়না বেচে দিয়েছ।

হরিশচন্দ্র মাথা নেড়ে বলে, ওরে না না, ওটা বাড়িয়ে বলেছে। আসলে অভাবের সংসারে কতরকম টানাটানি থাকে। তুই যখন ছোটো ছিলি, তখন বোধহয় দুধ জোটাতে না পেরে একদিন আংটি না কি যেন নিয়ে বন্ধক দিই। তা সে ফের ছাড়িয়েও এনেছি।

তোমার হাত থেকে গয়নাগুলো বাঁচাতে মা সেগুলো দিদিমার কাছে রেখে গিয়েছিল।

হরিশচন্দ্র সাগ্রহে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্বীকার করেছে তাহলে? তা কোথায় রেখেছে সেসব?

পিপুল মাথা নেড়ে বলে, তা আমি জানি না।

হরিশচন্দ্রের চোখ জুলজুল করছিল লোভে। বলল, চারদিকে নজর রেখেছিলি? নাকি আদরে-আহ্লাদে একেবারে ভোম্বল হয়ে আছিস?

আমার তো গয়নার খোঁজে দরকার নেই।

আহা, তোর দরকারের কথা ওঠে কীসে? আইনত ন্যায্যত গয়না হল আমার সম্পত্তি। তোর দিদিমাকে ইচ্ছে করলে আমি জেলে পাঠাতে পারি, তা জানিস?

পিপুল এই অদ্ভুত লোকটাকে হাঁ করে দেখছিল। তার দিদিমা এত অত্যাচার, প্রতিবাদ, গঞ্জনা সয়ে তাকে আগলে রেখেছিল বলে সে আজও বেঁচে আছে। সেই দিদিমাকে এ লোকটা জেল খাটাতে চায়!

সে এবার নাবালক থেকে সাবালক হয়ে বেশ ধমকের গলায় বলল, দিদিমা তোমার গুরুজন না?

এঃ গুরুজন! গুন্ডা লাগিয়ে যখন আমাকে মার দিয়েছিল তখন গুরুজন কোথায় ছিল বাবা!

দিদিমা মোটেই গুন্ডা লাগায়নি।

সব শেয়ালের এক রা। এদের হাড়ে হাড়ে চিনি কিনা। এখন শোনো, আমি সামনের শুক্কুরবার আবার আসব। চারদিক আঁতিপাঁতি করে দেখে রাখবি। আর দিদিমার সঙ্গে নানা কথাবার্তার ফাঁকে সুলুকসন্ধান জেনে নিবি। বোকা হয়ে থাকিস না, বুঝলি?

ও গয়না আমি বড়ো হলে আমাকে দেবে দিদিমা।

হরিশচন্দ্র একগাল হেসে বলে, ওরে আমিও তো সেটাই চাই। আমার কাছে থাকলে তোরই থাকল। দিদিমা বুড়ো মানুষ, কবে মরেটরে যায়। তার আগেই ওগুলো হাত করা দরকার। যদি সন্ধানটাও জানতে পারিস, তাহলে আমি লোক লাগিয়ে হলেও ঠিক জিনিসটা উদ্ধার করব।

চুরি করবে?

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয় রে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। অন্যের জিনিস গাপ করে বসে আছে, চোর তো তোর দিদিমাই। আমার জিনিস আমি ফেরত নিলে কী চুরি করা হয়।

পিপুল খুব রেগে যাচ্ছিল। বলল, তুমি খুব খারাপ লোক।

খারাপ লোক! কেন, খারাপটা কী দেখলি শুনি? আজ আমার অবস্থা পড়ে গেছে, সবাই অচ্ছেদা করে বলে তুইও করবি? তুই না আমার ছেলে?

পিপুল মাথা নেড়ে বলে, তুমি খারাপ লোক। সবাই বলে তুমি আমার মাকে খুন করেছ। তুমি মদ খেয়ে মাতলামি করো।

হরিশচন্দ্র আগের হরিশচন্দ্র হলে এবং পিপুল চার বছর আগেকার পিপুল হলে এই সময়ে পিপুলের গালে চড়-থাপ্পড় পড়তে পারত। কিন্তু হরিশচন্দ্রের শরীর জীর্ণ-শীর্ণ, দুর্বল। সে ধান্ধাবাজ ও লোভী। সেইজন্য এতটা উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আর তার নেই। সে ছেলের সঙ্গে এঁটে উঠবে না এটা আন্দাজ করেই নিজের রাগ সামলে নিয়ে মিঠে গলায় বলল, তুই তো দেখিসনি, তোর কালীমামা লোক জুটিয়ে নিয়ে গিয়ে কী মারটাই না মেরেছিল আমাকে। সর্বাঙ্গে হাজারটা ক্ষত। বাঁ চোখটা ভগবানের দয়ায় বেঁচে গিয়েছিল, নইলে কানা হয়ে যাওয়ার কথা। তোর বাপকে মারল, আর তুই ওদের পক্ষ নিয়েই কথা বলছিস! আমি ভালো বাবা না হতে পারি, কিন্তু বাবা তো!

তাতে কী হল? তুমি তো আমার খোঁজও নাওনি?

কেন, আমি শ্রীপদকে পাঠাইনি চিঠি দিয়ে তোকে নিয়ে যেতে? তোর দিদিমাই তো তোকে আটকে রেখেছিল।

দিদিমা তো ভালোই করেছিল। শ্রীরামপুরে গিয়ে কী হত? সবাই মিলে মারধর করে, খেতে-পরতে দেয় না, সব সময়ে গালাগাল করে।

ছেলেপুলেকে শাসন সবাই করে-ওটা ধরতে নেই।

গত চার বছরে তুমি তো আর আমার খোঁজ নাওনি!

হরিশচন্দ্র মৃদু মৃদু হেসে বলল, খোঁজ নিইনি কে বলল? এখানে আমার মেলা চর আছে। তারা ঠিক খবর দিত। তবে নিজে আসতাম না অপমানের ভয়ে। তা ছাড়া তোকে নিয়ে গিয়ে সৎমার হাতে ফেলতেও ইচ্ছে যায়নি। এ মাগীও বড্ড বদরাগী। তা তুই কি রেগে আছিস আমার ওপর বাবা?

পিপুলের চোখে জল আসছিল। বাবাকে সে ভালোবাসে না তেমন, তবু এই ভাঙাচোরা লোকটাকে দেখে তার কষ্ট হয়। মিথ্যেবাদী, পাজি, নিষ্ঠুর, মমতাহীন, মাতাল, স্বার্থপর এ লোকটা তার বাবা না হলে সে হয়তো খুশি হত। কিন্তু এ লোকটাকে একেবারে মুছেও তো সে ফেলতে পারেনি।

পিপুল বলল, বাবা বাড়ি যাও। মায়ের গয়না দিদিমা লুকিয়ে রেখেছে, কেউ তা খুঁজে বের করতে পারবে না।

হরিশচন্দ্র এবার তেরিয়া হয়ে বলে, এঃ, লুকিয়ে রাখলেই হল? দেশে আইন নেই? পুলিশ নেই?

পিপুল বলল, অত সব আমি জানি না। গয়না দিদিমা তোমাকে দেবে না।

তাহলে তুই আমার সঙ্গে চল!

কেন যাব?

তুই গেলে ওই বুড়ি নরম হয়ে পড়বে। নাতির মায়া বড় মায়া। সুড়সুড় করে গয়না বের করে দেবে তখন।

আমি শ্রীরামপুর যাব না।

আহা, বেশিদিনের জন্য বলছি না। সাতটা দিন একটু থেকে আসবি চল, তার মধ্যেই আমি বুড়িকে পটিয়ে মাল বের করে নেব।

পিপুল মাথা নেড়ে বলল, না বাবা, তুমি বাড়ি যাও। আমি তোমার সঙ্গে যাব না, দিদিমার কাছেই থাকব।

আজ বুঝি আমার চেয়েও দিদিমা তোর আপন হল! আমি যে ওদিকে না খেয়ে মরছি!

তুমি তো চাকরি কর।

সে চাকরি কবে চলে গেছে।

কালীমামা তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল না?

সেসব কবে ফুঁকে দিয়েছি। পাঁচ হাজারের অর্ধেকই তো গুন্ডাটা কেড়ে নিল। ক-টা টাকাই বা পেয়েছিলাম। দে বাবা এ যাত্রাটা উদ্ধার করে।

আমি তো গয়নার খবর জানি না–আমি পারব না।

হরিশচন্দ্র খুবই হতাশ হল। গয়নাগুলোই ছিল তার শেষ আশাভরসা। সে উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থেকে কাহিল গলায় বলল, তাহলে একটা কাজ করবি বাবা?

কী কাজ?

তোর দিদিমাকে গিয়ে বল গে, আমার অবস্থা এখন-তখন। দু-শোটা টাকা চাই। না, দাঁড়া –দু-শো নয়, চাইলে একটু বেশিই চাইতে হয়, কষাকষি করে ওই দু-শোই দেবে–তুই পাঁচ-শো চাস।

শোনো বাবা, তুমি আবার এসেছ শুনলে এবার কিন্তু মামারা তোমাকে ছাড়বে না। সবাই খুব রেগে আছে তোমার ওপর।

হরিশচন্দ্র কেমন ক্যাবলাকান্তের মতো ছেলের দিকে চেয়েছিল। কথাটা যেন বুঝতে পারল না। বলল, টাকাটা এনে দিলেই চলে যাব। তোর দিদিমার অনেক টাকা। দিদিমা যদি না দিতে চায়, দাদুকে বলিস। শ্বশুরটা খুব কেপ্পন ছিল বলে তার কাছে চাইতে ইচ্ছে যায় না। তবে শাশুড়িটা খুব খারাপ ছিল না। শালা-সম্বন্ধীরা ছিল এক নম্বরের খচ্চর। যা বাবা, ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আয়। নাহলে বেঘোরে মারা পড়ব।

পিপুল শেষ অবধি গিয়েছিল দিদিমার কাছে। সব কথা খুলে বলেছিল।

দিদিমার মনটা বড়ো নরম। জামাইয়ের অবস্থা শুনে চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে। বলে, কিছু চাইছে বোধহয়?

প্রথমে দু-শো টাকা চেয়েছিল। পরে বলল, পাঁচ-শো। বলল, কষাকষি করে ওই দু-শোই দেবে।

দিদিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তার চরিত্র ভালো নয়, আবার বিয়ে করে আর একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছে। সংসারে টান পড়ায় এসে হাজির হয়েছে। টাকা কিছু দিতে পারি, তবে ভয় হয় টাকা নিয়ে গিয়ে মদ গিলে পড়ে থাকবে হয়তো।

তাহলে বলে দিই যে হবে না!

না, একেবারে শুধু হাতে ফেরানোর দরকার নেই। পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছি, দিয়ে আয় গে, বলিস যেন মদটদ না-খায়।

পিপুল অবাক হয়ে বলল, দেবে?

যদি কষ্ট পায়।

বাবাকে আমি চিনি দিদিমা, টাকা পেলেই মদ খাবে।

তা কপালে কষ্ট লেখা থাকলে আর কী করা যাবে! যা দিয়ে আয়।

পিপুল পঞ্চাশটা টাকা এনে দিলে। হরিশচন্দ্র পাওনাগন্ডা বুঝে নেওয়ার মতো স্বাভাবিক ভাবেই টাকাটা পকেটে রাখল। যেন হকের টাকা। বলল, এ বাজারে পঞ্চাশে কিছু হয়? তোর দিদিমার নজরটা বড়ো ছোটো। আমি আজ যাচ্ছি-ফের আসব সামনের হপ্তায়। এর মধ্যে গয়নাগুলোর একটা খোঁজখবর করে রাখিস।

৪. পিপুল লজ্জায় মরে গেল

রণেশের সঙ্গে তার বউয়ের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। তার মস্ত কারণ একটা মেয়ে। আর্ট কলেজের এই ছাত্রীটি রণেশের সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে একটা বিশেষ কারণে। মেয়েটির বাবা প্রভাবশালী লোক। তাঁর সহায়তায় রণেশ প্যারিসে একটা এক বছরের বৃত্তি পায় এবং বিদেশে প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়। রণেশ যখন বিদেশে যায় তখন মেয়েটাও আগেভাগে গিয়ে প্যারিসে বসে আছে। শোনা যায়, সেখানেই তাদের মেলামেশা মাত্রা ছাড়াতে শুরু করে। রণেশ প্যারিসে থাকে এক বছর। এক বছরে মেয়েটি অন্তত তিনবার প্যারিসে যায়।

এসব খবর চাপা থাকে না। পল্লবিত হয়ে এদেশেও এসে পৌঁছোয়। রণেশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং তৎসহ পয়সা বেড়েছে। পোশাক বদলেছে। সবচেয়ে বেশি বদলেছে মেজাজ। রণেশ চল্লিশোর্ধ্ব। এ বয়সে কাঁচা মেয়ের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা যেমন রোমাঞ্চক তেমনি বিপজ্জনক।

রণেশ যখন প্যারিসে তখন পিপুল রণেশের স্টুডিয়ো দেখেশুনে রাখত। রণেশের রং তুলি নিয়ে ক্যানভাসে ইচ্ছেমতো ছবিও আঁকত। রণেশ তাকে সে অধিকার দিয়েই গেছে।

এক রবিবার রণেশের স্টুডিয়োতে বসে সকালের আলোয় ছবি আঁকছিল পিপুল, এমন সময় দরজার কড়া নড়ল। দরজা খুলে পিপুল দেখে, রণেশের পুরুষালি কুচ্ছিত বউ ধারাশ্রী দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রমহিলা একটু কঞ্জুস এবং খিটখিটে। কণ্ঠস্বরে মিষ্টতা নেই। সম্ভবত বউয়ের জন্যই রণেশ আলাদা থাকত। পিপুলও ধারাশ্রীকে তেমন পছন্দ করে উঠতে পারেনি কখনো।

কিন্তু এই সকালে ধারাশ্রীর মুখচোখের ভাব অন্যরকম। ভীষণ অসহায়, বিবর্ণ, কাঁদো কাঁদো।

পিপুল একটু অবাক হয়েই বলল, আসুন কাকিমা।

ধারাশ্রী ভিতরে এল। চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে গা এলিয়ে হাঁফ ছাড়ল কিছুক্ষণ। ধারাশ্রী কদাচিৎ এখানে আসে। আসবার দরকারই হয় না। কলকাতায় তাদের নিজস্ব চমৎকার একখানা বাড়ি আছে। ছেলে-মেয়েরা ভালো ইস্কুলে পড়ে। গাড়ি কেনা হয়েছে সম্প্রতি।

ধারাশ্রী হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তুমি রণিতা বলে কোনো মেয়েকে চেনো?

পিপুল অবাক হয়ে বলে, রণিতা চৌধুরি? হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছিল।

এখানে আসত?

দু-বার এসেছিল।

দু-বার? এসে কি রাত কাটিয়েছে?

পিপুল তটস্থ হয়ে বলে, না। রণেশকাকার সঙ্গে ছবি নিয়ে কীসব কথাবার্তা হচ্ছিল। দু বারই বিকেলের ট্রেনে ফিরে গেছে।

ঠিক জান? নাকি লুকোচ্ছ?

না, আমি জানি। রণিতাদিকে আমি নিজেই ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছি।

ধারাশ্রী হঠাৎ বলল, ওদের সম্পর্কটা কীরকম তা কি তুমি জান?

না তো! কী জানব?

ন্যাকা সেজো না। এখন বড়ো হয়েছ, সবই তোমার বুঝবার কথা।

আমি কিছু জানি না।

রণেশ যে রণিতাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে তা জান?

হতভম্ব পিপুল বলে, না তো!

তুমি খুব সেয়ানা ছেলে, তাই না? সব জেনেও বোকাটি সেজে আছ। রণিতা আর রণেশের বৃন্দাবন ছিল এইখানে। তুমি রণেশের শাগরেদ, তোমার না জানার কথা নয়।

পিপুল বিপদে পড়ে বলল, আমি কিছুই জানি না।

জানলেও বলবে না। তুমিই ওই রায়বাড়ির ভাগ্নে! তোমার বাবা তো শুনেছি মাতাল আর লম্পট। তুমি তো চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা হবেই।

পিপুল এখন কলেজে পড়ে, দাড়ি কামায় এবং একটা ছোটোখাটো দলের সর্দারি করে। এ তল্লাটে তার একটা নামডাক আছে। ছেলেবেলায় যা হয়েছে হয়ে গেছে। কিন্তু এখন কেউ তাকে এত সরাসরি অপমান করতে সাহস পায় না। তার আত্মমর্যাদাজ্ঞান খুব টনটনে। রণেশের বউ বলে সে এতক্ষণ কিছু বলতে দ্বিধা করছিল, কিন্তু এবার আর সামলাতে পারল না। বলল, আপনি এত অভদ্র কেন?

এ কথায় ধারাশ্রীর ফেটে পড়ার কথা রাগে। কিন্তু ফল হল উলটো। হঠাৎ ধারাশ্রী হাউমাউ করে কেঁদে মুখ ঢাকল শাড়ির আঁচলে। তারপর অনেকক্ষণ শুধু কাঁদল। পিপুল ভ্যাবাচ্যাকা।

কান্নার পর যে ধারাশ্রী মুখ তুলল সে অন্যরকম–দুঃখী, নরম, অনুতপ্ত। পিপুলের দিকে চেয়ে বলল, তুমি কি কিছুই জান না পিপুল?

পিপুলও অনুতপ্ত। বিনয়ী গলায় বলল, এটা মফস্সল। এখনও এখানে কেউ কিছু শোনেনি।

রণেশ তোমাকেও বলেনি কখনো?

না। বিশ্বাস করুন।

করছি। কাউকে বিশ্বাস করা আমার এখন বড্ড দরকার। রণেশ ব্যাংকের আমার অ্যাকাউন্টে প্রায় চার লাখ টাকা ট্রান্সফার করেছে। কলকাতার বাড়ি আমার নামেই ছিল, এখনও আছে। রণেশ দাবি তুলবে না। তার বদলে সে মুক্তি চাইছে–রণিতাকে বিয়ে করবে।

পিপুল চুপ করে রইল। তার মনে পড়ল, রণেশ তাকে মাঝে মাঝে বলত, পুরুষমানুষদের, বিশেষ করে শিল্পীদের একজন মাত্র মহিলা নিয়ে থাকা অসম্ভব। প্রকৃতির নিয়ম এরকম নয়।

ধারাশ্রী বলল, রণিতা ওর হাঁটুর বয়সি। এমন কিছু সুন্দরী কী তুমিই বলো!

পিপুল দেখেছে, রণিতা খুব সুন্দরী না হলেও মুখশ্রী ভারি মিষ্টি। কালোর ওপর ছিপছিপে ছোটোখাটো চেহারা। চোখে সমসময়ে একটু অবাক দৃষ্টি।

পিপুল মাথা নেড়ে বলে, না, তেমন সুন্দরী নয়।

তাহলে? তাহলে ও এরকম করল কেন?

আপনি অস্থির হবেন না কাকিমা।

ধারাশ্রী অবাক হয়ে বলে, হব না! কী বলছ? আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, তবু অস্থির হব না?

পিপুল নম্র গলায় বলে, রণেশ কাকা কিন্তু এখানে কখনো কোনো বাড়াবাড়ি করেননি। আপনমনে ছবি আঁকতেন। কখনো কখনো আমার সঙ্গে বসে ছবি নিয়ে কথা কইতেন।

তুমি হয়তো সব জান না। ওদের মাখামাখি এখানেও হত। অবশ্য সেটা জেনেই-বা আর আমার লাভ কী? আমার যা সর্বনাশ হওয়ার তো হয়েই গেছে।

কিন্তু রণেশকাকা তো এখন প্যারিসে!

সেখান থেকেই খবর আসছে। কয়েকদিন আগে রণেশ একটা চিঠি লিখেছে আমাকে। তাতে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছে। যদি না ভাঙি, তাহলে ও রণিতাকে নিয়ে আলাদা থাকবে।

আপনি রণেশকাকাকে কী লিখলেন?

কিছু লিখিনি। উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি। উকিল বলেছে, বিয়ে যদি আমি ভাঙতে না চাই, তাহলে ও কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তাতে কী লাভ বল! তুমি এখনও তেমন বড়ো হওনি, তোমার কাছে বলতে লজ্জা করে। তবু বলি, আমার রূপ নেই, ছবি আঁকতে পারি না, ছবি বুঝিও না, বয়সও হচ্ছে-কী দিয়ে রণেশকে বেঁধে রাখব বলো তো? বিয়ে না ভাঙলেই কী আর ও বশ মানবে?

পিপুল খুব সংকোচের সঙ্গে বলে, রণেশকাকা তো এমনিতে বেশ ভালো লোক।

সে তোমাদের কাছে। আমি ওর স্ত্রী, আমার চেয়ে ভালো আর ওকে কে জানে!

এখানে কেউ রণেশকাকার চরিত্র নিয়ে কখনো কিছু বলেনি?

এখানকার লোক ওকে জানে না। অনেকদিন ধরেই ও আর আমাকে পছন্দ করছে না, টের পাচ্ছি। এখানে পড়ে থাকে, কলকাতায় যেতে চায় না। গেলেও কেমন আলগোছ হয়ে থাকে। আমাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না, তুমি কি জান?

পিপুল না বলতে পারল না। কথার ফাঁকে ফাঁকে রণেশ তাকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নয়। ধারাশ্রী বড্ড অহংকারী আর আত্মসর্বস্ব। রণেশের টাকার দিকেই তার নজর। পিপুল অবশ্য সেসব বলল না। মুখে সমবেদনা মেখে বসে রইল সামনে।

ধারাশ্রী অনেক কথা বলল। বিয়ের পর প্রথম চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে শুধু পরস্পরের ওপর নির্ভর করে কেমন করে তারা বেঁচে ছিল। কত ভালোবাসা আর বিশ্বাস ছিল দু-জনের প্রতি দু-জনের। বহুবার কাঁদল ধারাশ্রী।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছিল, পিপুল জোর করে ধারাশ্রীকে নিয়ে গেল দিদিমার কাছে। ভাত খাওয়াল। তারপর বলল, বিকেলের গাড়িতে আমি গিয়ে কলকাতায় পৌঁছে দেব আপনাকে। আপনি একটু ঘুমোন।

খুবই ক্লান্ত ছিল ধারাশ্রী। বোধহয় রাতের পর রাত ঘুমোয় না। বলতেই বিছানায় শুল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যের সময় উঠে বলল, পিপুল, তুমি আজ আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে, কিন্তু তোমাকে ফিরতে দেব না–কাল ফিরো।

টালিগঞ্জের বাড়িতে একবার আগেও এসেছিল পিপুল। সুন্দর ছোটো একখানা দোতলা বাড়ি। একতলায় সবটা জুড়ে স্টুডিয়ো। ছবি বিশেষ নেই। কারণ রণেশের ছবি আজকাল আঁকা মাত্র বিক্রি হয়ে যায়।

রণেশের দুই মেয়ে, এক ছেলে। ছেলে বড়ো, মেয়েরা কিশোরী। ফুটফুটে সুন্দর চেহারা তাদের। মা-বাবার ডিভোর্সের আশঙ্কায় প্রত্যেকেই কেমন যেন ভীতু, লাজুক আর সংকুচিত। কথা বলছে না কেউ।

এরকম মুহ্যমান বাড়িতে থাকা খুব কষ্টকর। পিপুলের অস্বস্তি হচ্ছিল।

এত দুঃখের মধ্যেও ধারাশ্রী তার কোনো অযত্ন করল না। নিজের হাতে রান্না করে তাকে খাওয়ালো রাতে। বলল, তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে। আমার জীবনটা যে ছারখার হয়ে গেল সে-কথা তো সবাইকে বলা যায় না।

পিপুল বুঝতে পারছিল না, তাকেই বা ধারাশ্রী এত দুঃখের কথা বলতে চায় কেন? সে তো ধারাশ্রীর কাছে প্রায় অচেনা একটি ছেলে। তাকে আজ ধরেই বা রয়েছে কেন ধারাশ্রী?

নীচের স্টুডিয়োতে একটা ক্যাম্প-খাটে বিছানা পাতাই থাকে। রণেশ এখানে বিশ্রাম নেয়। সেই বিছানায় শুয়ে সবে চোখ বুজেছে পিপুল, এমন সময় ধারাশ্রী এল। একটা চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসে বলল, আমি এখন অনেক কথা বলব তোমাকে। শুধু শুনে যেও, জবাব দেওয়ার দরকার নেই। কথাগুলো বলতে না পারলে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব।

পিপুল উঠে বসে বলল, আপনি বলুন।

সারারাত কথা বলল ধারাশ্রী। তাদের প্রেমের কথা, বিয়ের কথা, ছেলে-মেয়ে জন্মানোর কথা, দারিদ্র্যের কথা, তারপর প্রেমছুট হওয়ার কথা, তার সঙ্গে ধারাশ্রীর নিজের জীবনের নানা ঘটনার কথা বলতে বলতে কথার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। অসংলগ্ন হয়ে পড়ছিল। পিপুল খুব মন দিয়ে অনুধাবন করছিল ধারাশ্রীকে। কিন্তু বুঝতে পারছিল ধারাশ্রী স্বাভাবিক নেই। খানিকটা পাগলামি দেখা দিয়েছে বোধহয়।

সকালে ধারাশ্রী এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল ঘাড় কাত করে। সকালে রণেশের ফুটফুটে বড়ো মেয়েটি নেমে এল দোতলা থেকে। মাকে চেয়ারে বসে ঘুমোতে দেখে একটু অবাক হয়ে পিপুলের দিকে চেয়ে বলল, ইজ শি সিক?

পিপুল কী বলবে ভেবে পেল না। মাথা নেড়ে বলে, বুঝতে পারছি না। সারারাত কথা বলেছেন।

আজকাল মা বড্ড বেশি কথা বলছে। একা-একাও বলে। ওকে কি ডাক্তার দেখানো উচিত?

আমার তো সেটাই ভালো মনে হয়।

আপনি কি আজকের দিনটা থাকতে পারবেন?

কেন বল তো?

মেয়েটা লাজুক মুখে বলল, আসলে আমাদের মন ভালো নেই কারো, মা যদি সিক হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদের কিছু হেল্প দরকার।

পিপুল বলে, যদি কিছু করার থাকে করব। ওটা নিয়ে ভেবো না।

ডাক্তার এল, দেখল। সঙ্গেসঙ্গে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল ধারাশ্রীকে। তারপর বলল, এ বাড়িতে বড়ো কেউ নেই?

পিপুল বলল, আমি আছি।

ওঃ! বলে ডাক্তার তার বড়ত্বে একটু সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, এক্সট্রিম মেন্টাল প্রেসার। হাইপারটেনশনটাও বিপজ্জনক। প্রেসক্রিপশন দিয়ে যাচ্ছি, ওষুধগুলো ঠিকমতো যেন দেওয়া হয়।

একদিনের জায়গায় পিপুলকে থাকতে হল তিন দিন। তিন দিন কাটল দারুণ উদ্বেগে, অনিশ্চয়তায়। ঘুম ভাঙলেই ধারাশ্রী নানা অসংলগ্ন কথা বলে, হাসে, কাঁদে। বিছানা ছেড়ে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল একবার। বিছানার কাছাকাছি পিপুল চেয়ারে বসে থাকে দিন-রাত। প্রয়োজন হলে ডাক্তার ডাকে ফোনে, ওষুধ এনে দেয়। তিন দিন ধরে সে বুঝতে পারল, রণেশের তিন ছেলে-মেয়েই অপদার্থ বাস্তববুদ্ধিবর্জিত। অতি আদরে এরা কেউ কাজের মানুষ হয়নি। এমন কী রান্না-খাওয়া অবধি বন্ধ হতে বসেছিল। পিপুল বেগতিক দেখে বাজার করে আনল, নিজেই রান্না করল এবং পরিবেশন করে খাওয়াল সবাইকে। মায়ের অসুখে ভেঙেপড়া তিনটে ছেলে- মেয়েকে প্রবোধ দেওয়ার কাজটাও তাকে করতে হল সঙ্গেসঙ্গে।

বড়ো মেয়েটির নাম অদিতি। ফর্সা। দারুণ সুন্দর বছর সতেরোর মেয়েটিকে মেমসাহেব বলে ভুল হয়। অন্য দুটিও প্রায় সমান সুন্দর, কিন্তু অদিতি দারুণ। কিন্তু সুন্দর বলেই কী একটু বেশি সরল? মাঝে মাঝেই সে পিপুলকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা পিপুলদা, মা যদি মরে যায়, তাহলে আমাদের কী হবে? বাবা তো আর আমাদের বাবা নেই!

কে বলল নেই?

বাবা যদি রণিতাকে বিয়ে করে, তাহলে কি আর বাবা আমাদের বাবা থাকবে?

বাবা সব সময়েই বাবা। কিন্তু অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? কাকিমা ঠিক ভালো হয়ে উঠবেন। ওঁর অসুখটা সিরিয়াস নয়। মেন্টাল শক থেকে ওরকম হয়।

অদিতির চোখ ছলছল করে, মা ছাড়া আমাদের যে কী হবে?

রণেশের বড়ো সন্তানটি ছেলে, তার নাম অতিথি। ছোটোটি মেয়ে-তার নাম মোনালিজা। তারা চমৎকার দুটি ছেলে-মেয়ে, কিন্তু তাদেরও বাস স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে। এই বাস্তব পৃথিবীর কিছুই প্রায় তারা জানে না। সারাদিন তারা পিপুলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, পিপুল যা করার করবে, তাদের যেন কিছু করার নেই। তবে তারা পিপুল যা বলে তাই নীরবে এবং বিনা প্রতিবাদে করে। এমনকী পিপুলের সঙ্গে রাতেও জেগে থাকার চেষ্টা করতে করতে ধারাশ্রীর বিছানার চারপাশে নানা ভঙ্গিতে শুয়ে বা বসে ঘুমিয়ে পড়ে।

জেগে থাকে পিপুল। চুপচাপ বসে বই পড়ে, কিংবা ভাবে। তার ঢুলুনিও আসে না। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে পাঞ্জা কষে সে বড়ো হচ্ছে। সে তো এদের মতো পরীর রাজ্যের মানুষ নয়।

দ্বিতীয়ত রাতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে অদিতি বলল, আচ্ছা পিপুলদা, তোমাকে কি আমি এক কাপ কফি করে দেব?

হঠাৎ একথা কেন?

আমার বাবা যখন রাত জাগে তখন কফি খেতে দেখেছি।

পিপুল হাসল, আমি চা বা কফি বিশেষ খাই না। আমার কোনো নেশা নেই।

আমার বাবা হুইস্কি খায়, তুমি খাও?

অদিতি আপনি থেকে প্রথম দিনেই তুমিতে নেমে গেছে। তিন ভাই-বোনই তাকে বোধহয় একটু আপনজন বলে ধরে নিয়েছে, তাই দাদা আর তুমি বলছে। পিপুলের ভালোই লাগছে এদের।

সে বলল, আমি মদ খাই না। কোনোদিন খাবও না।

কেন খাবে না? খাওয়াটা খারাপ, তাই না?

খুব খারাপ। মদ খেত বলেই তো আমার বাবার আজ কত দুর্দশা। তাকে দেখেই আমার চোখ খুলে গেছে।

মার কাছে শুনেছি তোমার খুব দুঃখ। সত্যি?

কাকিমা তোমাকে বলেছে বুঝি?

তোমাকে যখন নিয়ে এল তখন আমাদের আড়ালে বলেছে। তুমি কি খুব গরিব?

খুব। দিদিমার কাছে আশ্রয় না পেলে কী হত কে জানে।

আমার বাবাও খুব গরিব ছিল, জান?

জানি। রণেশকাকা আমাকে সব বলেছে।

গরিব কি ভালো হয়?

তার কী কিছু ঠিক আছে? ভালোও হয়, মন্দও হয়।

তুমি কিন্তু খুব ভালো। ভীষণ।

পিপুল হাসল। এই সরলা বালিকার মধ্যে এখনও পাপ ঢোকেনি। এদের ভগবান কী চিরকাল এরকম নিষ্পাপ রাখবেন?

তিন দিন বাদে চতুর্থ দিন সকালে ধারাশ্রী তার বিপদ কাটিয়ে উঠে বসল। শরীর দুর্বল, কিন্তু রক্তচাপ কমছে। কথাবার্তার অসংলগ্নতাও আর নেই। ছেলে-মেয়েদের কাছে ডেকে অনেকক্ষণ তৃষিত চোখে চেয়ে দেখল তাদের। তারপর বলল, এ ক-দিন কি করলি তোরা? কে তোদের দেখল?

কেন, পিপুলদা! সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

ধারাশ্রী পিপুলের দিকে চেয়ে বলল, তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম, তাই না?

আপনার কষ্টের তুলনায় আমারটা কিছুই না। আপনি ওসব ভাববেন না।

তোমার কলেজের ক্ষতি হল তো?

পুষিয়ে নেবো। আজকাল কলেজে তেমন পড়াশুনো হয় না।

দিদিমা ভাবছে না?

দিদিমা একটু ভাববে। তাই আজ একবার বাড়ি যাব।

এসো গিয়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে চলে এসো। তোমার রণেশকাকা আমাদের ত্যাগ করেছে, তাই বলে তুমি কোরো না কিন্তু।

এতকাল দিদিমা ছাড়া আর কারো মায়া ছিল না তার। এই প্রথম রণেশের পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তিন দিনে মায়ায় জড়িয়ে পড়ল নাকি সে!

ফিরে আসার পর রণেশের স্টুডিয়োতে বসে ছবি আঁকতে আঁকতে প্রায়ই তিন দিনের নানা স্মৃতি এসে হাজির হয়। অদিতির মুখখানা খুব মনে পড়ে তার। আঁকতে চেষ্টা করে, পারে না অন্যরকম হয়ে যায়।

তিন মাস আর কোনো খোঁজখবর নেয়নি পিপুল। মন থেকে ধীরে ধীরে মুছেই যাচ্ছিল ওরা। পিপুলের নিজেরও অনেক কাজ। পড়াশুনো, ব্যায়াম, ছবি আঁকা, পরোপকার করে বেড়ানো। মাসতিনেক বাদে হঠাৎ একদিন রণেশ এসে হাজির। চেহারাটা অনেক ভালো হয়েছে, গায়ের রং ফর্সা হয়েছে, মুখটা একটু বেশি গম্ভীর।

পিপুলের সঙ্গে দেখা হতে বলল, কেমন আছিস?

ভালো। আপনি কেমন?

আমিও ভালো। তুই তো দেখছি অ্যাডাল্ট হয়ে গেছিস!

পিপুল অস্বস্তির সঙ্গে হাসল।

রণেশ তার ঘরে আরামচেয়ারে বসে মাথার পাতলা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, আমার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছিস, না?

হ্যাঁ। কাকিমা খুব আপসেট।

হওয়ারই কথা। কুড়ি বছরের ম্যারেড লাইফ। একটা অভ্যাসও তো হয়ে যায়।

আপনি কাকিমার কাছেই আছেন তো?

দেখা করেছি, কিন্তু থাকব না। এত পাগলামি করছে যে সহ্য করা মুশকিল।

আপনি কি রণিতাদিকে বিয়ে করবেন?

বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। ধারা তো ডিভোর্স দেয়নি। তবে দিলে ভালো করত। এখন ও পাগলামি করছে বটে, কিন্তু মরা-সম্পর্ককে কী বাঁচানো যায়?

পিপুল মরা বা জ্যান্ত কোনো সম্পর্কের কথাই জানে না। তবে নিজের বাবার কথা মনে পড়লে সে একটা মৃত সম্পর্কের জের টের পায়। জন্মদাতা বাপ, তবু কতই না পর!

রণেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ধীরস্বরে বলল, কখনো আমাকে মানুষ বলেই ধারা গ্রাহ্য করল না। আমার ভালো-মন্দ দেখল না। এখন যেই সম্পর্ক ভাঙতে চলেছে তখন ক্ষেপে উঠেছে। এসব পাগলামিকে ভালোবাসা বা সেন্টিমেন্ট বলে ভাবিস না যেন–এ হল আহত অহং। ও রণিতার কাছে হার মানতে চাইছে না।

আপনি তাহলে কী করবেন?

রণেশ হাসল। বলল, আমার তো এসকেপ রুট আছেই। ছবি আঁকব, ছবিতে ডুবে যাব।

আর কাকিমা?

তবে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে। তবে আমি তো নিষ্ঠুর নই। মেয়েরা যত নিষ্ঠুর হতে পারে, ছেলেরা তত পারে না।

রণিতাদির কী হবে?

রণিতা আধুনিক মেয়ে। সে হিসেব না কষে কাজ করে না।

তার মানে কি কাকা?

রণিতা আর আমি প্ল্যান করেছি, ধারা ডিভোর্স না দিলে আমরা অন্য কোনো রিলিজিয়নে কনভার্ট করব। তখন অসুবিধে হবে না। কিন্তু এসব তোকে বলছি কেন রে পাগলা! এসব হচ্ছে জীবনের কুৎসিত দিক। এগুলোর দিকে নজর দিস না। তুই আমাকে খারাপ ভাবিস নাকি?

না। যার হাতে অত সুন্দর ছবি বেরোয়, সে কী খারাপ হতে পারে?

ঠিক বলেছিস। দুঃখের বিষয়, আমি ছবিতে ডুব দিতে পারি কিন্তু ধারা ডুব দেবে কীসে? ওর তো একটা এসকেপ রুট দরকার, তাই না?

আমি জানি না।

ওর জন্য একটু ভাবিস তো। আগে গান গাইত–চর্চাটা রাখেনি। চর্চা থাকলে ওই গানই ওকে বাঁচিয়ে দিত। যাদের কোনও শিল্প নেই, শখ নেই তাদের বড়ো কষ্ট–তাই না?

বোধহয়।

আয়, আজ দু-জনে ছবি আঁকি।

দু-জনে পাশাপাশি বসে গেল ছবি আঁকতে। আঁকতে আঁকতে রণেশ প্যারিসের গল্প করছিল মাঝে মাঝে। মহান সব ছবির গল্প, শিল্পীদের গল্প, বিদেশের নানা অভিজ্ঞতার গল্প। বলতে বলতে হঠাৎ বলল, ওঃ হ্যাঁ, ভালো কথা! তোর কথা আমার ছেলে-মেয়েরা খুব বলছে আজকাল!

তাই নাকি?

ওরে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ওদের তুই মেসমেরাইজ করে এসেছিস–তোর কাকিমাকেও।

পিপুল লজ্জার সঙ্গে হাসল।

রণেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুই না থাকলে ধারার কী হত কে জানে! আমার ছেলেমেয়েরা তুলোর বাক্সে মানুষ হয়েছে, দুনিয়ার আঁচ টেরই পায়নি কখনো। তুই সেসময়ে না থাকলে ওরা দিশেহারা হয়ে যেত। কী যে করত কে জানে!

কাকিমা এখন ভালো আছেন?

শরীর খারাপ নয়, তবে মনে হয় প্রেসারটা ক্রনিক হয়ে গেল। একটু হার্টেরও প্রবলেম। তবে সিরিয়াস কিছু নয়।

কাকিমা কিন্তু সে-দিন পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

শুনেছি। তোকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল। তবে সে ভাবটা এখনও আছে। বেশি কথা বলছে, বেশি কাঁদছে, বেশি চেঁচামেচি করছে। আয়, ওসব কথা ভুলে যা। ছবি আঁক, ছবি তোকে সব ভুলিয়ে দেবে। দুনিয়া নিয়ে বেশি ভাববি না কখনো। ওটা আমাদের কনট্রোলে তো নেই।

দু-জনে অনেকক্ষণ নীরবে ছবি আঁকল। অখন্ড মনোযোগে।

রণেশ বলল, তোর স্ট্রোক অনেক পাওয়ারফুল হয়েছে তো! খুব খেটেছিস মনে হচ্ছে! কালারসেন্সটা এখনও গ্রো করেনি–আয় তোর ছবিটা একটু রিটাচ করে দিই। দেব?

সে তো আমার ভাগ্য।

পোর্ট্রেট করতে ভালোবাসিস বুঝি? এটা কার মুখ?

মন থেকে আঁকা।

রণেশ পাকা আর্টিষ্ট, প্রতিভাবানও। দু-একটা শেড পালটে দিল, দু-চারটে নতুন টান মারল। তারপরই হঠাৎ ঝকঝকে করে হেসে উঠল একটা চেনা মেয়ের মুখ।

রণেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে ছবিটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তাই তো ভাবছি মুখটা এত চেনা-চেনা ঠেকছিল কেন! এ তো অদিতি!

এই বলে হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে রণেশ। পিপুল লজ্জার মরে গেল।